শুকতারা
পঞ্চবিংশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৭৯

যে সব বই হাতে পেলে ছেলেরা আর কিছু চায় না, তেমনি কয়েকখানি বই !!!

অ্যাড্‌ভেঞ্চার

দৃষ্টিহীনের

মরণদূতের আনাগোনা	...	২·৫০
বটকালীর জঙ্গলে	...	২·০০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

হিমালয়ের ভয়ঙ্কর	...	১·৫০
দেড়শো খোকার কাণ্ড	...	১·৫০
অমানুষিক মানুষ	...	১·৫০
সাজাহানের ময়ূর	...	১-৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রক্তমুখী ড্রাগন	...	১·২৫
বিষের তীর	...	১·২৫

দীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

ডাকাতের মুখোমুখী	...	১·২৫
তেপান্তরের মাঠ	...	১·০০

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দৌলতখানা	...	১·৫০
শতবর্ষ পরে	...	২·০০
শয়তানের ঘাঁটি	...	১·২৫

রূপকথা

ঠাকুরমার ঝুলি	...	৬·০০
ঠানদিদির থলে	...	৫·০০
পুরনো দিনের পুরনো গল্প	...	৩·০০
ঠাকুরমার গল্প	...	১·০০

হাসির গল্প

হিপ্ হিপ্ হুরে	...	৪·০০
জন্মদিনের উপহার	...	৪·০০
যত হাসি ততই মজা	...	৪·০০
হাসির এ্যাটম বোম	...	৪·০০
হাসির টেক্কা	...	৪·০০

ভৌতিক গল্প

ভূত-পেত্নী দত্যি-দানা	...	৪·০০
রাক্ষস খোক্কস	...	৪·০০
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প	...	৩·০০

শিকার কাহিনী

বাঘ ভালুকের দেশে	...	৪·০০
বনে জঙ্গলে	...	৩·০০
শিকারের গল্প	...	১·৫০

এমনি আরও অসংখ্য বই

চিঠি লিখলে বিনা মূল্যে পুস্তক তালিকা পাঠান হয়।

দেব সাহিত্য কুটীর * ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

বাঁটুল দি গ্রেট

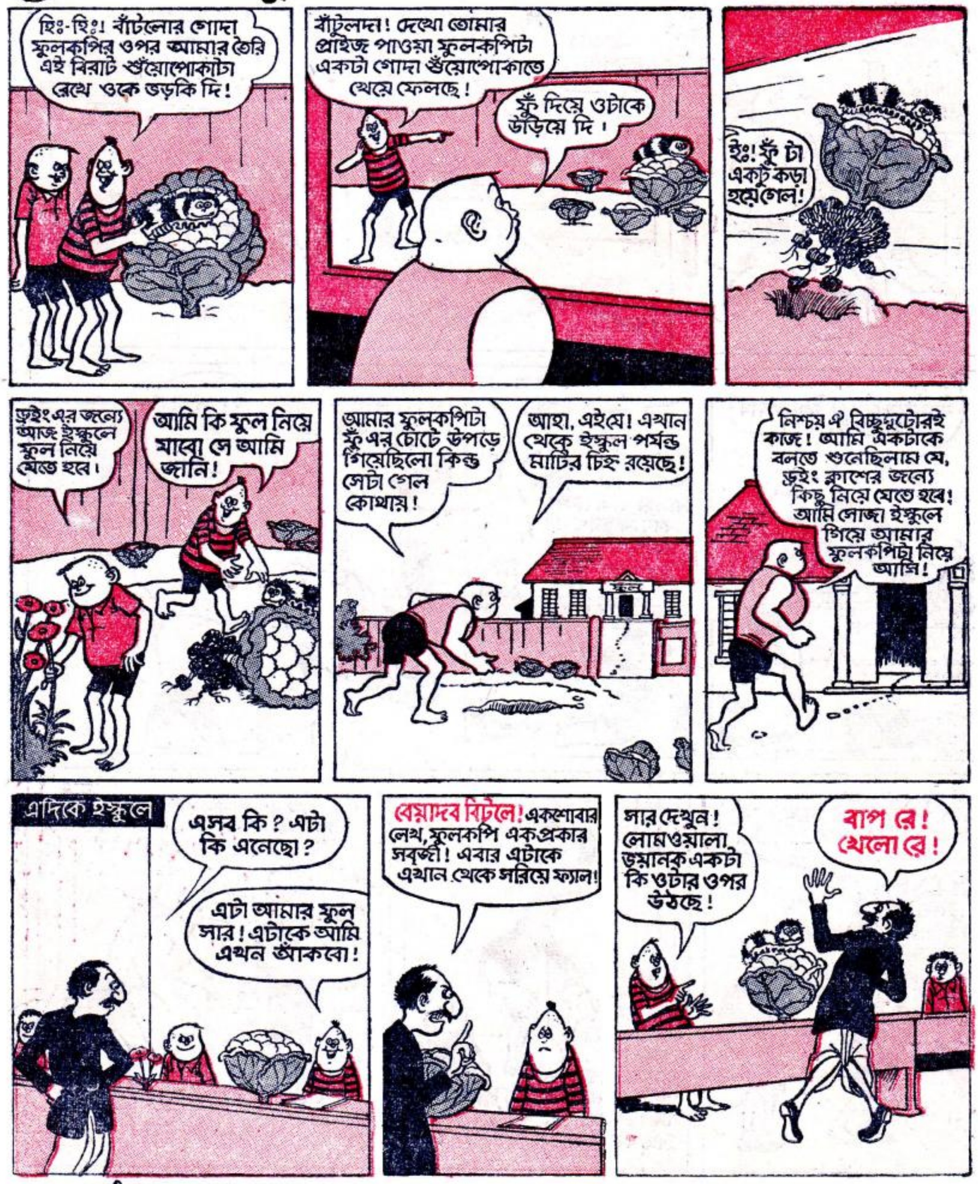

হিঃ-হিঃ! বাঁটলোর গোদা ফুলকপির ওপর আমার তৈরি এই বিরাট শুঁয়োপোকাটা রেখে ওকে ভড়কি দি!
বাঁটুলদা! দেখো তোমার প্রাইজ পাওয়া ফুলকপিটা একটা গোদা শুঁয়োপোকাতে খেয়ে ফেলছে!
ফুঁ দিয়ে ওটাকে উড়িয়ে দি।
ইঃ! ফুঁ টা একটু কড়া হয়েগেল!
ড্রইং এর জন্যে আজ ইস্কুলে ফুল নিয়ে যেতে হবে।
আমি কি ফুল নিয়ে যাবো সে আমি জানি!
আমার ফুলকপিটা ফুঁ এর চোটে উপড়ে গিয়েছিলো কিন্তু সেটা গেল কোথায়!
আহা, এইযে! এখান থেকে ইস্কুল পর্যন্ত মাটির চিহ্ন রয়েছে!
নিশ্চয় ঐ বিচ্ছুদুটোরই কাজ! আমি একটাকে বলতে শুনেছিলাম যে, ড্রইং ক্লাশের জন্যে কিছু নিয়ে যেতে হবে! আমি সোজা ইস্কুলে গিয়ে আমার ফুলকপিটা নিয়ে আসি!
এদিকে ইস্কুলে
এসব কি? এটা কি এনেছো?
এটা আমার ফুল সার! এটাকে আমি এখন আঁকবো!
বেয়াদব বিটলে! একশোবার লেখ, ফুলকপি একপ্রকার সবজী! এবার এটাকে এখান থেকে সরিয়ে ফ্যাল!
সার দেখুন! লোমওয়ালা ভয়ানক একটা কি ওটার ওপর উঠছে!
বাপ রে! খেলো রে!

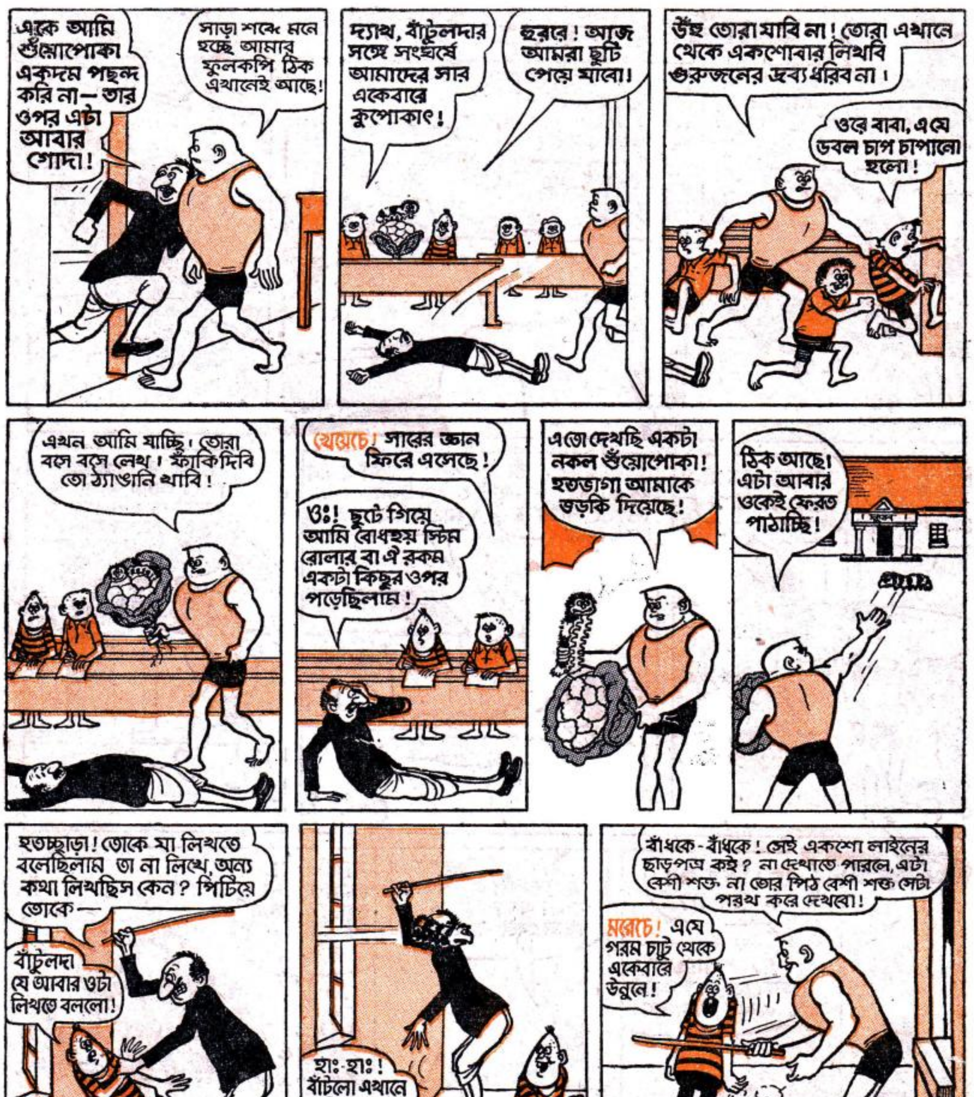
একে আমি শুঁয়োপোকা একদম পছন্দ করি না— তার ওপর এটা আবার গোদা!
সাড়া শব্দে মনে হচ্ছে আমার ফুলকপি ঠিক এখানেই আছে!
দ্যাখ, বাঁটুলদার সঙ্গে সংঘর্ষে আমাদের সার একেবারে কুপোকাৎ!
হুররে! আজ আমরা ছুটি পেয়ে যাবো।
উঁহু তোরা যাবি না! তোরা এখানে থেকে একশোবার লিখবি গুরুজনের দ্রব্য ধরিব না।
ওরে বাবা, এ যে ডবল চাপ চাপানো হলো!
এখন আমি যাচ্ছি। তোরা বসে বসে লেখ। ফাঁকিদিবি তো ঠ্যাঙানি খাবি!
খেয়েচে! সারের জ্ঞান ফিরে এসেছে!
ওঃ! ছুটে গিয়ে আমি বোধহয় স্টিম রোলার বা ঐ রকম একটা কিছুর ওপর পড়েছিলাম!
এতো দেখছি একটা নকল শুঁয়োপোকা! হতভাগা আমাকে ভড়কি দিয়েছে!
ঠিক আছে! এটা আবার ওকেই ফেরত পাঠাচ্ছি!
হতচ্ছাড়া! তোকে যা লিখতে বলেছিলাম তা না লিখে, অন্য কথা লিখছিস কেন? পিটিয়ে তোকে—
বাঁটুলদা যে আবার ওটা লিখতে বললো!
হাঃ-হাঃ! বাঁটলো এখানে আটকে মার খাওয়ানোর তালে ছিলো। এখন নিজেই আবার উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিলো!
বাঁধকে-বাঁধকে! সেই একশো লাইনের ছাড়পত্র কই? না দেখাতে পারলে, এটা বেশী শক্ত না তোর পিঠ বেশী শক্ত সেটা পরখ করে দেখবো!
মরেচে! এ যে গরম চাটু থেকে একেবারে উনুনে!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৭৯

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	মরণের ডাক	তুষার চ্যাটার্জী	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	নারায়ণ দেবনাথ	প্রথম ছবি
৩।	অট্টহাসির অট্টালিকা (কবিতা)	শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩৭
৪।	পরীক্ষার মডেল (জানবার কথা)	—	৫৩৮
৫।	রূপকথার ফুলঝুরি (গল্প)	ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য	৫৩৯
৬।	বল্ তো দেখি (মজার ছবি)	—	৫৫০
৭।	বেলুন পাহাড়ের বিচিত্র কাহিনী (গল্প)	অদ্রীশ বর্ধন	৫৫১
৮।	কালের ভাগ্য ঃ প্রকৃতির মাইক্রোফোন (জানবার কথা)		৫৬৩
৯।	আগন্তুক (ছবিতে গল্প)	ময়ূখ চৌধুরী	৫৬৪
১০।	উত্তর মেরু পথে পিয়ারী (বিদেশী গল্প)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	৫৭২
১১।	৫৫০ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর	—	৫৭৯
১২।	চেরা-কেশরী শঙ্করীপদ (অমরবীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	৫৮০
১৩।	বিষুব রেখার অন্তরালে (ধারাবাহিক কাহিনী)	শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু	৫৮৯
১৪।	জননী (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	অরুন্ধতী রায়চৌধুরী	৫৯৭
১৫।	দিদির খোঁজে (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	সুধাংশুশেখর মহাপাত্র	৬০১
১৬।	"৺শ্রীপদ দে স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)		৬০৩
১৭।	হাঁদা-ভোঁদার এ্যক্‌টিং (ছবিতে গল্প)	—	৬০৪
১৮।	তিন বন্ধুর কেরামতি (গল্প)	বিশ্ববন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০৬
১৯।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)	—	৬০৮

এস. সি মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৮০ পয়সা

everest/122b/PP ben

পঞ্চবিংশ বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা
১৩৭৯, আশ্বিন

অট্টহাসির অট্টালিকা

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

অট্টহাসির অট্টালিকায়
হল্লা করে আয়না
যেখানটাতে মেটানো যায়
ইচ্ছে মতন বায়না।

হিহি-হাসির হোহো-হাসির
আছে অনেক কামরা
দেঁতো-হাসি ফোগ্‌লা হাসি
থাকবো সবাই আমরা।

যেখানটাতে খুশীর আলো
নেভানো ভাই যায় না
কানটা মুলে চড় কষালেও
কান্না কিছুই পায় না।

এই বাড়িটার বাসিন্দারা
জোর গলাতে হাঁকে

"পাঁচশো ঝামা ঘষে দেবো
গোমড়ামুখোর নাকে;"

দস্যি ছেলে দুষ্টু ছেলে
সবাই এসে জোট্ না
আটশো সিঁড়ি একটি দমে
লাফিয়ে তোরা ওঠ্ না।

কেউ যেখানে একটি গান-ও
গলা চেপে গায় না!
বিনা ভাড়ায় এমনি বাড়ি
কোথাও পাওয়া যায় না।

পরীক্ষার মডেল

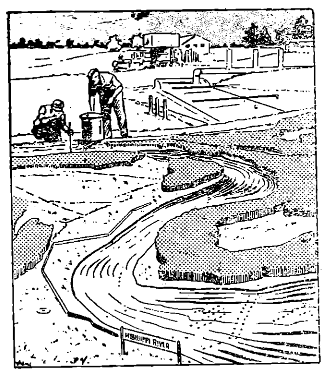

ছবিটা হল আমেরিকার মিসিসিপি নদী ও তার শাখা উপশাখা সমেত সমস্ত ভূভাগের ক্ষুদ্র মডেল। মডেল হলেও আয়তনে প্রায় ৬০০ বিঘার সমান। আসল নদীর ভূভাগ হল ১৫০০০০০ স্কোয়ার মাইল বিস্তৃত। এই মডেল তৈরি করে ইঞ্জিনিয়াররা নানা রকম পরীক্ষা করে দেখেন হঠাৎ নদীর জল জমে বরফ হয়ে গেলে কিংবা প্রচণ্ড বর্ষায় নদীর জল বেড়ে উঠলে আশপাশের জমিতে কি ক্ষতি হতে পারে। এই পরীক্ষা থেকে জ্ঞান লাভ করে আসল নদীর বেলা কোন কিছু ঘটলে তাঁরা মানুষ ও সম্পত্তি বাঁচাতে পারেন।

রূপকথার ফুলঝুরি

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য

হিমালয়ের গভীর অরণ্যে এক সাধু থাকতেন। তাঁর দুই চেলা অর্থাৎ শিষ্য ছিল। তারা কখনও অরণ্যের বাইরে যে গ্রাম শহর আছে তা দেখেনি। কারণ সাধুই তাদের নিষেধ করে দিয়েছিলেন—বনের বাইরে কোন লোকালয়ে যেও না। চেলা দুটি মাঝে মাঝে লোকালয়ে যাবার জন্যে ছটফট করতো। সেখানে অনেক লোকের বসবাস। কতই না রং তামাশা, হইচই। বাজার হাট, লোকজন চারদিকে গমগম করছে। এই বনে একেবারে সব নিস্তব্ধ নিঝুম। মাঝে মাঝে বড় একঘেয়ে লাগে। সাধুকে বার বার অনুরোধ করেও অনুমতি পায় না। একবার সাধু খুব শক্ত অসুখে পড়লেন। চেলা দুটি দিন রাত খুব যত্ন সহকারে সাধুর সেবা করতে লাগল। সাধু সেরে উঠলেন। খুশী হয়ে চেলা দুটিকে বললেন, ‘তোরা কি চাস বেটা বল তোদের দোব।’ চেলা দুটি সময় বুঝে বলল, ‘বাবা, আমরা একবার শহর, গ্রাম, লোকালয় দেখতে চাই, আপনি অনুমতি দিন!’ তখন সাধু বললেন, ‘আচ্ছা বেটা, একজন করে যাও, একজন আমার কাছে থাকে।’ সন্তুষ্ট হয়ে প্রথম চেলাটি খুব উৎসাহে ও আনন্দে শহর দেখতে যাচ্ছে, এমন সময় সাধু বললেন, ‘কিন্তু খুব সাবধান, যেতে যেতে যদি এমন কিছু দেখো, যা তুমি বুঝতে পারবে না, তৎক্ষণাৎ ফিরে এস। আর এগিও না।’ চেলা বললে, ‘যে আজ্ঞে মহারাজ।’

প্রথম চেলা মহানন্দে যাত্রা করল। পাহাড়, ঝরনা, বন-জঙ্গল, নদী-নালা পেরিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। লোকালয়ের সন্ধান আর পায় না। সারাদিন পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে

কোন গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে। আবার প্রত্যুষে উঠেই হাঁটতে আরম্ভ করে। এইভাবে দিনকয়েক হাঁটবার পরে দূরে কিছু ধোঁয়া দেখতে পেল। এইবার মনে আশা হল। সত্যিই কিছু দূর এগিয়ে যেতে দেখে এক মস্ত শহর। বাড়ি ঘর লোকজন জমজম করছে। শহর ঘুরতে ঘুরতে সেখানকার রাজবাটীর সামনে এসে হাজির হল। সেখানে এক অদ্ভুত জিনিস সে দেখতে পেল। রাজার সিংহ দরজার ওপর একটা কাটা ছাগলের মুণ্ড দেখতে পেল! সেই কাটা ছাগলের মুণ্ডটা কখন হাসছে, কখন কাঁদছে। চেলা এ দৃশ্য দেখে সত্য সত্যই অবাক্ হয়ে গেল। মনে ভাবলো—এ কি ব্যাপার? কাটা ছাগলের মুণ্ডটা কি করেই বা হাসছে, আর কি করেই বা কাঁদছে! এর কারণই বা কি? সেখানে অনেককে এ প্রশ্ন করেও কোন জবাব পেল না। তখন সাধুর কথা তার মনে হল। সে আর এক পা-ও না এগিয়ে ফিরে এল। সাধু তাকে ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল বেটা, এর মধ্যে ফিরে এলি?' প্রথম চেলা বলল, 'বাবা, শহরে রাজবাটীর সিংহদ্বারে একটা কাটা ছাগলের মুণ্ড দেখলুম, সে কখন হাসছে কখন কাঁদছে। এর কারণ কি বুঝলুম না তাই ফিরে এলুম।' সাধু হেসে বললেন, 'বেশ করেছ ফিরে এসেছ। এর কারণ কি তোমাদের বলছি, মন দিয়ে শোন।'

এক দেশে এক রাজা ছিল। তাঁর রাজ্যে কেউ কাজ করে অথবা খেটে কিংবা রোজগার করে খেতে পাবে না। প্রজাদের খাওয়া পরা ভরণ-পোষণ সব কিছুর ভার ও দায়িত্ব রাজার। রাজার সিপাহী পল্টনের কাজ হল—সারা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে দেখা কেউ কোন কাজ করছে কিনা তার জীবিকানির্বাহের জন্যে। যদি এমন কোন লোককে দেখা যায় যে সেরূপ কিছু কাজ করছে—তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে এনে রাজার কাছে হাজির করবে।

অন্য দেশে এক তাঁতী বাস করতো। সে বড় গরিব। তাঁত চালিয়ে গামছা বোনা তার পেশা। তার কাজকর্ম ভাল চলছিল না। ব্যবসা পত্তর খুবই মন্দা। সংসার চালানো দায় হয়ে উঠেছে। সে একজনের মুখে এই রাজার রাজ্য সম্বন্ধে সব শুনল। মনে ভাবল সেখানে নিশ্চয়ই কোন তাঁত নেই। যদি সেখানে গিয়ে তাঁত চালিয়ে গামছা বুনতে পারি তো অবস্থা ফিরে যাবে। সেখানে খাবো দাবো রাজার খরচায়—আর গামছা বেচে যা পয়সা পাবো দেশে পাঠিয়ে দোব।

তখন সস্তা গণ্ডার সময়। এক টাকায় সুতো রং সব কিনে তাঁতী সেই দেশে গিয়ে হাজির। একটা গোপন আস্তানা দেখে নিজের কাজ শুরু করে দিল। দিনের বেলা জানা-জানির ভয়ে কাজ করতো না। নিশুতি রাতে যখন সকলে ঘুমোত, সে তখন খটাখট খটাখট করে বুনতে আরম্ভ করে দিত।

এক রাত্রে পাহারা দেবার সময় রাজার সিপাই তাকে ধরে ফেলে রাজার কাছে নিয়ে

গেল। রাজা প্রশ্ন করলেন—'তুমি জানো না, আমার রাজ্যে কোন কাজ করা নিষেধ ?' তাঁতী জবাব দিল—'মহারাজ, আমি অন্য দেশ থেকে এসেছি। আমি এসব জানতুম না। আমায় ক্ষমা করুন। আমি বড় গরিব। সংসারের খরচ চালাতে না পেরে এই কাজ করছিলুম।'

রাজা বললেন—'তোমার সংসারে মাসে কত খরচ পড়ে ?' তাঁতী হিসেব করে বলল—'আজ্ঞে তিরিশ টাকা হলে আমার মাস চলে যায়।' রাজা হুকুম দিলেন একে তিরিশ টাকা দিয়ে দেবার জন্যে। আর বলে দিলেন, 'তুমি প্রতি মাসে তিরিশ টাকা করে পাবে। খবরদার কোন কাজকর্ম করবে না।' তাঁতী সন্তুষ্ট হয়ে তিরিশ টাকা নিয়ে গিয়ে উনত্রিশ টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে এক টাকায় আবার রং সুতো কিনে সেই খটাখট খটাখট করে গামছা বুনতে শুরু করে দিল।' পুনরায় রাজার সিপাই তাকে ধরে নিয়ে এল। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবার তুমি তাঁত বুনছিলে কেন ?' তাঁতী বলল, 'মহারাজ, আমি হিসেব করে দেখলুম, তিরিশ টাকায় আমার সংসার ঠিক চলে না। চল্লিশ টাকা হলে বেশ চলে যায়। রাজা হুকুম দিলেন একে চল্লিশ টাকা দিয়ে দিতে। আবার বলে দিলেন, 'আর কখনও তাঁত চালাবে না। প্রতি মাসে তোমার হিসেব মত চল্লিশ টাকাই পাবে। যাও।' হৃষ্টচিত্তে তাঁতী চল্লিশ টাকা নিয়ে চলে গিয়ে উনচল্লিশ টাকা বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে পুনরায় এক টাকায় রং সুতো কিনে খটাখট খটাখট করে তাঁত চালাতে শুরু করে দিল। আবার সিপাই তাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা এবার খুবই রেগে গেলেন। রাগবারই কথা। বার বার এ অপরাধ করছে, রক্তবর্ণ চক্ষু করে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবার তুমি তাঁত বুনছিলে ?' তাঁতী বলল, 'মহারাজ, বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে হিসেব করে দেখলুম, পঞ্চাশ টাকা হলে আর আমার কোন অভাব থাকে না।'

রাজা পুনরায় হুকুম দিলেন—একে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও। সেই সঙ্গে তাঁতীকেও সাবধান করে দিলেন—'খবরদার ! আর যেন তাঁত চালিও না।' 'যে আজ্ঞা মহারাজ' বলে তাঁতী পঞ্চাশ টাকা নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে চলে গেল। আবার সেই এক কথা। উনপঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বাকী এক টাকায় রং সুতো কিনে এনে সেই ঠকাঠক ঠকাঠক। আবার সিপাহীরা ধরে নিয়ে এল রাজার কাছে। এবার রাজা রেগেমেগে বললেন ওকে ঘণ্টা ঘরে কাজ দাও। আর বাইরে যেতে দিও না। তাই হল। তাঁতীকে ঘণ্টা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাকে বলা হল, যখন যত বাজবে ততবার তুমি ঘণ্টা বাজাবে, অর্থাৎ একটা বাজলে একবার ঘণ্টা বাজাবে, দুটো বাজলে দুবার ঘণ্টা বাজাবে। এইভাবে তার কাজ চলবে। সেও ঘণ্টা ঘরে চুপচাপ বসে থাকে, যখন যত বাজে ততবার ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজায়।

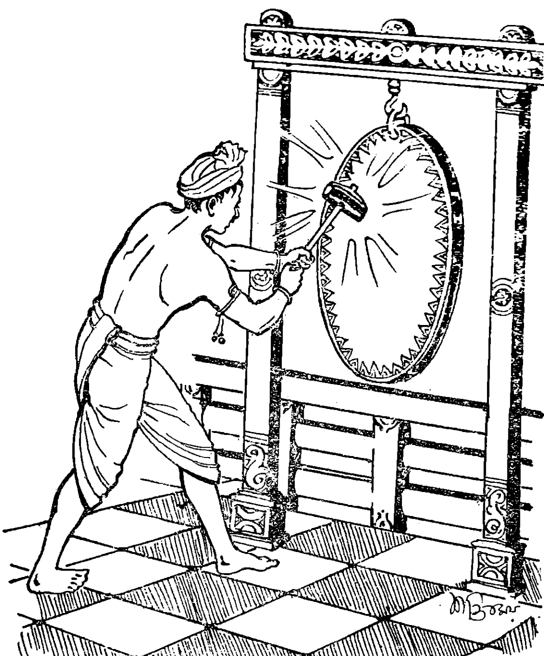

যখন যত বাজে ততবার ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজায়। [পৃষ্ঠা ৫৪১

একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাজা স্বপ্ন দেখছেন—কোন এক জায়গায় তিনি বেড়াতে গিয়েছেন, সেখানে তরতর করে ঝরনার জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তিনিও তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। যেতে যেতে দেখেন যে একটা সোনার মাছ সেই জলে খেলা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজা তাই না দেখে সেই মাছটাকে ধরতে যাচ্ছেন। এই ধরে ফেলেন ঠিক এই সময় ঢং ঢং করে বারোবার ঘণ্টা বেজে ওঠে। রাজার ঘুম ভেঙে যায়। রাজা রেগে হুকুম দিলেন, ধরে আন ঐ তাঁতীকে। এমন সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলুম, মাছটাকে এই ধরি এই ধরি করছিলুম। আর একটু হলেই ধরে ফেলতুম। কিন্তু ঠিক আসল সময়েই ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে? আর ঘণ্টা বাজাবার সময় পেলে না?

তাঁতীকে টানতে টানতে রাজার কাছে নিয়ে এল। তাঁতী রাজাকে সেলাম করে দাঁড়াল। রাজা বলল, 'আমি এমন সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলুম, তুমি ঠিক সেই সময় কেন ঘণ্টা বাজালে?' তাঁতী বলল, 'মহারাজ আমার কাজ ঘণ্টা বাজানো। রাত্রি বারোটা বেজেছে, আমি ঘণ্টা বাজিয়েছি। সে সময় কে স্বপ্ন দেখছে, কে দেয়লা করছে, তা তো আমি জানি না, আর তা ছাড়া আমার জানবার প্রয়োজনই বা কি?' রাজা তাঁতীর কথা শুনে খুবই রেগে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, 'একে ঘাড় ধরে এ রাজ্য থেকে বার করে দাও।' সিপাহীরা ঘাড় ধরে মারতে মারতে তাঁতীকে রাজ্যের বার করে দিল।

তাঁতী মনের দুঃখে অজানা পথে এগিয়ে চলল। কত নদ-নদী বন-জঙ্গল পেরিয়ে তাঁতী চলেছে তো চলেইছে। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে এক গাছের তলায় বসে পড়ল। বসে বসে চারিদিকে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

সামনে তরতর করে পরিষ্কার ঝরনার জল বয়ে যাচ্ছে। তাঁতী সেই প্রবহমান জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল সেই জলের ভেতর একটা সোনার মাছ খেলে খেলে চলে যাচ্ছে। তাঁতী উঠেই সেই মাছটাকে ধরতে গেল। তাঁতী যত এগিয়ে যায় মাছও তত এগিয়ে যায়। ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না। হঠাৎ যেই মাছটাকে ধরতে গেছে অমনি একটা জলের ঘূর্ণির ভেতর পড়ে তাঁতী জলের তলায় তলিয়ে গেল।

জলের নীচে গিয়ে তাঁতী একেবারে অবাক্। চারদিকে চেয়ে দেখে, এত সুন্দর জায়গা জীবনে এর আগে কখনও দেখেনি। সুরম্য অট্টালিকা, সরোবর, তার মাঝে পদ্মফুল, পুকুরে রাজহংস কেলি করছে। শ্বেত প্রস্তরের শান-বাঁধানো, চোখ-ধাঁধানো ঘাট। সরোবরের চার পাশে নানা জাতের ফুলের বাগান, তাতে অজস্র ফুলের সমারোহ, গন্ধে আমোদিত করছে চারদিক। যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে সে এসে গেছে। চারদিকে বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাঁতী। গাছগুলি ফলভারে নত। নানারকম সুস্বাদু ফল তাঁতী গাছে উঠে পাড়ে আর খায়। কিন্তু লোকজন কোথাও কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। সারাদিন মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছে, আর গাছের ফল খেয়েছে। শেষে ক্লান্ত হয়ে সেই পাথরের বাঁধান ঘাটে শুয়ে পড়ল। শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। শয়নেই বিলম্ব, যেমনি শয়ন অমনি অচেতন।

সেই সুরম্য অট্টালিকায় তিন পরী বাস করত। তারা তিনজনই আপন সহোদরা ভগ্নী। ছোট ভগ্নীটি মর্ত্যের মানুষকে বিয়ে করতে চায়। এর জন্যে তিন ভগ্নীতে খুব মত-ভেদ চলছিল। অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ছোট ভগ্নীর বিয়ে দিয়ে তারা স্বর্গে ফিরে যাবে। কিন্তু পাত্র কোথায়? অতএব তারা এই মায়াপুরি রচনা করে স্বর্ণ-মৎস্য দ্বারা প্রলোভন দেখিয়ে মর্ত্যের মানুষকে এখানে নিয়ে আসবে। যে মানুষই আসুক, সারাদিন এখানে ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে এই শ্বেত প্রস্তরনির্মিত বাঁধান ঘাটে এসে ঘুমিয়ে পড়বেই। তখন তিন ভগ্নী অট্টালিকা থেকে বেরিয়ে এসে সেই ঘুমন্ত মানুষের কানের কাছে তিনবার হাততালি দেবে। এতে যদি তার ঘুম ভেঙে যায়, তো তার সঙ্গে ছোট ভগ্নীর বিয়ে দেবে। আর যদি ঘুম না ভাঙে তো যেখান থেকে সে মানুষ এসেছে সেইখানে পৌঁছে যাবে। যথানিয়মে তিন ভগ্নী ঘুমন্ত তাঁতীর কানের কাছে এসে তিনবার হাততালি দিল। বেটা তাঁতীর পো, দিনভোর ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে এসে শুয়েছে। মোষের মত পড়ে অকাতরে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভাঙবে কেন? ঘুম না ভাঙ্গতে তাঁতী আবার সেই রাজার ঘণ্টাঘরে পৌঁছে গেল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে তাঁতী দেখল বারোটা বেজেছে। অমনি ঢং ঢং করে বারোটা

ঘণ্টা বাজালো। ওদিকে ঘণ্টার শব্দে রাজার ঘুম ভেঙে গেল। রাগ করে রাজা বললেন, 'কে ঘণ্টা বাজালো?' রাজার অনুচরেরা এসে খবর দিল, 'মহারাজ সেই তাঁতীটা ঘণ্টা বাজিয়েছে।' 'এ্যাঁ? সে ঘণ্টাঘরে এল কি করে? তাকে তো তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? ডেকে নিয়ে আয় তাকে।' তাঁতীকে টেনে নিয়ে আশা হল। হাতজোড় করে তাঁতী বলল, 'মহারাজ! কি দোষে আমাকে এরা টেনে আনল?' 'তুমি ঘণ্টা বাজালে কেন? আর তুমি ঘণ্টাঘরে এলেই বা কি করে?' 'মহারাজ! সেদিন আমায় তাড়িয়ে দিলেন। যেতে যেতে এক জায়গায় একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলুম। ঝরনার জলের স্রোতে একটা সোনার মাছ খেলা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে ধরতে গেলুম। এই ধরলুম, এই ধরলুম, এই অবস্থায় একটা জলের ঘূর্ণিতে পড়ে গিয়ে একবারে পাতালে চলে গেলুম। সেখানে কি সুন্দর দৃশ্য তা মুখে বলতে পারবো না। তারপর যখন ঘুম ভেঙে গেল, দেখলুম আমি ঘণ্টাঘরে শুয়ে আছি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলুম বারোটা বেজেছে। তাই বারোটা ঘণ্টা মারলুম। এতে আমার কি দোষ হয়েছে মহারাজ?' রাজা বললেন, 'তুমি আমায় সে সোনার মাছ দেখিয়ে দিতে পারো?' 'আজ্ঞে নিশ্চয়ই পারি! আপনি চলুন আমার সঙ্গে।'

রাজা তাঁতীর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কারণ তাঁর স্বপ্নের সেই সোনার মাছ দেখবার খুবই আগ্রহ হয়েছিল। যে জিনিস তিনি স্বপ্নে দেখছিলেন, সেটা তাঁতী চাক্ষুষ দেখিয়ে দেবে, এর চেয়ে আর আশ্চর্য কি আছে!

তাঁতীর সঙ্গে রাজা রওনা হলেন। বন-জঙ্গল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে চলেছেন, পথের যেন শেষ নেই।

রাজা বললেন, 'তাঁতী আর কত দূর?' 'আজ্ঞে, মহারাজ, এই এল। ঐ যে ছোট পাহাড়টা দেখছেন, ওটা পেরোলেই আমরা ঝরনার স্রোত দেখতে পাবো। আর একটু ধৈর্য ধরুন মহারাজ!' যথাসময়ে সেই পাহাড় অতিক্রম করে তাঁরা ঝরনার স্রোতের মুখে এসে হাজির হলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর, হঠাৎ তাঁতী চিৎকার করে উঠল,—'ঐ দেখুন মহারাজ, ঐ সেই সোনার মাছ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলুন, মাছটাকে ধরে ফেলুন।'

রাজা আনন্দে ও উৎসাহে এগিয়ে চললেন। এই ধরি, এই ধরি করেও ধরতে পারছেন না। যতই তিনি এগিয়ে চলেন, মাছও তত এগিয়ে যায়। অবশেষে সেই জলের ঘূর্ণি দেখা গেল। যেই মহারাজ সেই ঘূর্ণির মুখে পড়েছেন, মাছ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, রাজা হুড়মুড় করে পাতালে প্রবেশ করলেন। তাঁতীও তাঁর পেছন পেছন এসে গেছে। কিন্তু রাজা সেটা বুঝতে পারেন নি। তিনি মনে করলেন একাই এসেছেন! তাঁতী বেটা ওপরেই থেকে গেছে। তাঁতীও রাজাকে দেখা না দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

রাজা সেখানকার মন-ভোলানো সৌন্দর্য দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সরোবরে

কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জলের ওপর রাজহংসী কেলি করছে। তার ওপর প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের অপূর্ব শোভা ভোলবার নয়। সামনেই সুরম্য অট্টালিকার প্রতিচ্ছবি সরোবরের জলে পড়ে নাচানাচি করছে। চারিদিকে ফুলের বাগান, তাতে নানা জাতীয় ফুল ফুটে আছে। তার সৌরভ বাতাসে বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোকিলের কুহু কুহু, ভ্রমরের গুঞ্জনে যেন এক স্বপ্নরাজ্য বলে মনে হয়। তার চারিদিকে রসালো ফলের গাছ। গাছে গাছে ফল ঝুলছে। রাজা মনের আনন্দে, এ ফল, সে ফল, এ গাছ, সে গাছ থেকে পেড়ে পেড়ে খাচ্ছেন! তারপর ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এসে শ্বেত প্রস্তরনির্মিত ঘাটে এসে বসলেন। অট্টালিকার দিকে চেয়ে দেখলেন, কোন লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। পথশ্রমে ক্লান্ত রাজা সেই ঘাটেই শুয়ে পড়লেন। ফুলের গন্ধভরা ঠাণ্ডা দক্ষিণে বাতাসে রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিনবার হাততালি দিতেই রাজার ঘুম ভেঙে গেল।

এমন সময় সেই তিন ভগ্নী পরী বেড়াতে বেড়াতে সেই ঘাটের দিকে এল। বড় ভগ্নীটি বলল, ঐ দেখ আবার একটি নরলোক এসে এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখতে তো খুবই সুপুরুষ। এর সঙ্গে বিয়ে হলে ভাল হয়। দেখ, দেখ, ঠিক যেন রাজপুত্তুর। এবার দেখা যাক হাততালি দিয়ে ঘুম ভাঙে কিনা।

এক, দুই, তিন। তিনবার হাততালি দিতেই রাজার ঘুম ভেঙে গেল। উঠেই দেখেন তিন তিনটে অপ্সরী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। বড় ভগ্নী বললেন, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন? আপনার পরিচয় দিন।' রাজা নিজের পরিচয় দিলেন। বড় ভগ্নী বলল—'মহারাজ! আমার সর্বকনিষ্ঠ ভগ্নী মর্ত্যের মানুষকে বিয়ে করতে চায়।

সোনার মাছের ফাঁদ আমাদেরই সৃষ্টি। এই ভাবে মর্ত্যের মানুষ এখানে ধরা দেয়। আমাদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তিনবার হাততালিতে সেই ঘুমন্ত মানুষকে জাগাবার চেষ্টা করি। যাঁরা জাগেন না তাঁরা পূর্বের জায়গায় ফিরে যান। আপনি তিন হাততালিতে জেগে উঠেছেন। অতএব, আপনাকে আমার কনিষ্ঠ ভগ্নীর ভাবী স্বামীরূপে বরণ করতে চাই। আপনি অনুমোদন করুন।'

রাজা সানন্দে স্বীকৃতি দান করলেন। কারণ রাজাও অবিবাহিত পুরুষ ছিলেন। সুতরাং এ বিবাহে কোন প্রতিবন্ধক নেই। যথাকালে সেই পরীদের কনিষ্ঠ ভগ্নীর সঙ্গে রাজার বিয়ে হয়ে গেল। বড় ভগ্নী দুটি নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে স্বর্গে ফিরে গেল।

রাজার মধুচন্দ্রিকা সেইখানেই হল। মনের আনন্দে রাজা পরীকে নিয়ে সেখানেই কাটাতে লাগলেন। তাঁতীর পো লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছে। কিন্তু দেখা দেয় না। এমন কি ঘরের ভেতর স্বামিস্ত্রীতে কি কথাবার্তা হয়, বাইরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তা শোনে।

একদিন রাজা প্রস্তাব করলেন, 'অনেক দিন হল রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছি—হয়তো ওদিকে খুবই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। চলো এবার আমার রাজ্যে ফিরে যাই।' পরী বললে, 'আমি যেতে পারি, আমার মহল কিন্তু আলাদা দিতে হবে।' রাজা সম্মত হলেন। যাবার দিন ঠিক হয়। আবার পরী পিছিয়ে দেয়। এইভাবে কিছুদিন চলতে লাগল। রাজা একদিন ঘরে বসে পরীকে বললেন, 'আর দেরি করলে আমি নিজেই চলে যাবো। তুমি এখানে থাকো, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো।' পরী হেসে গড়িয়ে পড়ল, বলল, 'মহাভারতের অভিমন্যুর গল্প পড়েছ তো? বেচারা প্রবেশের পথ জানতো, বেরোবার পথ নয়। এখানে মর্ত্যবাসী আসে মায়া মৎস্যের দ্বারা চালিত হয়ে—আমাদের ইচ্ছা ছাড়া বেরোতে পারবে না। যদি আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাই, তবেই তুমি যেতে পারবে, নচেৎ সারাজীবন এইখানেই থাকতে হবে।' এই কথা শুনে রাজার মুখ শুকিয়ে গেল! পরী হেসে বলল, 'ভয় নেই, আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

তাঁতী বেটা লুকিয়ে এসব কথা শুনছিল। তার মনেও ভাবনা হল, রাজা না হয় পরীর সঙ্গে বেরিয়ে যাবে, আমি? আমি কি করব? যাই হোক, পরীর ও রাজার কথোপকথন চলতে লাগল, তাঁতীও সব শুনতে লাগল। পরী পুনরায় রাজাকে বলল, 'দেখুন মহারাজ পরীকে তো বিয়ে করলেন, পরীর গুণ কিছু শিখলেন না?' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি গুণ?' 'যে জিনিস মর্ত্যবাসীর অজানা তাই আপনাকে শিখিয়ে দোব।' রাজা বললেন,—'কি রকম?' পরী বললে, 'প্রথমে একটা জিনিস শেখাই কি করে একের আত্মা অপরের মৃতদেহে সঞ্চার করা যায়।' রাজা সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'শেখাবে? এসব শিখতে আমার বড় উৎসাহ।' পরী তখন রাজাকে এর মন্ত্র-তন্ত্র, প্রক্রিয়া সব শেখাতে

লাগল। তাঁতী বেটাও এসব শুনে শুনে শিখছিল। রাজার সব শেখা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁতীরও শেখা হয়ে গেল।

এইবার রাজার বাড়ি ফেরার পালা। সব তোড়জোড় হতে লাগল। দিন, সময়ও স্থির হয়ে গেল। তাঁতীর চিন্তা বেড়ে গেল! আমি কি করে ফিরব! মনে মনে স্থির করল, সুযোগ বুঝে রাজার সঙ্গে একান্তে দেখা করবে। একদিন রাজা বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় সেই তাঁতী তাঁর পা দুখানি জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। রাজা তাঁতীকে দেখে অবাক্ হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি করে এখানে এলে?' 'হুজুর, আমি আপনার পেছন পেছন এসেছিলুম।' 'আমার সঙ্গে দেখা কর নি কেন?' 'আজ্ঞে, ভয়ে। আপনি যদি সঙ্গে নিয়ে না যান, তো ফিরবো কি করে? আমি পালাবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পথ দেখতে পাইনি।'

রাজা তাঁতীকে আশ্বাস দিলেন—'আমি যখন যাবো, তোমায়ও নিয়ে যাবো।'

যথাকালে রাজার যাবার দিন স্থির হল। রাজা পরীকে তাঁতীর যাওয়া সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। পরী অনেক চিন্তা করে শেষে রাজী হল।

নির্বিঘ্নে রাজা, পরী ও তাঁতী পাতালপুরী থেকে বেরিয়ে এলেন। পরীর কথামত রাজা পরীর জন্যে একটি স্বতন্ত্র মহল দিলেন থাকবার জন্যে। সেই মহলের নাম হল পরী-মহল।

রাজা কিন্তু তাঁতীকে ছাড়লেন না। কারণ পাতালপুরীর কাহিনী সে সবই জানে। তাকে বাইরে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না! সেই জন্যে প্রলোভন দেখিয়ে তাকে মন্ত্রী করে নিজের কাছে রাখলেন।

তাঁতীর কিন্তু পরীকে কেন্দ্র করে রাজার ওপর ঈর্ষার ভাব আছে। একদিন রাজা তাঁতীকে নিয়ে বনে মৃগয়া করতে গেলেন। বনের ভেতর যেতে যেতে এক জায়গায় তাঁরা দেখতে পেলেন, একটা খুব সুন্দর দেখতে মরা ল্যাজকাটা বাঁদর পড়ে আছে। তাঁতী রাজাকে বলল,—'মহারাজ, আমার বড় দুঃখু হচ্ছে।' রাজা বললেন, 'কেন?' 'এমন সুন্দর বাঁদরটি পড়ে আছে একে জীবন দান করবার ক্ষমতা আপনার নেই। অথচ আপনি ঈশ্বরতুল্য মহারাজ?' রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'আমি একে বাঁচাতে পারি। কিন্তু একটা শর্তে।' 'তাঁতী জিজ্ঞাসা করল, কি শর্ত মহারাজ?' রাজা বললেন, 'বাঁদর বেঁচে উঠবে, কিন্তু আমি মারা যাবো।' তাঁতী বললে, 'আপনি মারা গেলে উপায়?' রাজা বললেন, 'এক উপায় আছে। তুমি পরীকে এখানে নিয়ে এস, যে পুনরায় বাঁদরকে মেরে আমায় বাঁচিয়ে দেবে।' তাঁতী বললে, 'বড় আশ্চর্যের কথা! আমি নিশ্চয়ই পরীকে নিয়ে আসব, আপনি আগে বাঁদরটাকে বাঁচান তো দেখি!'

রাজা বেঁচে উঠলেন, তাঁতীর লাশ পড়ে থাকল।

রাজা তাড়াতাড়ি মাথার পাগড়ি খুলে সেই কাপড় ঢাকা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। মন্ত্র পাঠ করে নিজের আত্মা বাঁদরের ভেতর দিলেন। বাঁদর বেঁচে ওঠে তড়াক করে লাফিয়ে বনের মধ্যে চলে গেল। রাজা মৃত অবস্থায় পড়ে রইলেন। তাঁতী ভাবলে এই হচ্ছে সুযোগ। পরী যখন পাতালে বসে রাজাকে এই আত্মা চালনার মন্ত্র শেখাচ্ছিল, সে সময় বাইরে থেকে তাঁতীও সেই মন্ত্র শিখেছিল। সে তাড়াতাড়ি মাথার পাগড়ি খুলে সেই কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে সেই মন্ত্র পাঠ করে নিজের আত্মা রাজার দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে। রাজা বেঁচে উঠলেন, তাঁতীর লাশ পড়ে থাকল। এখন রাজার ভেতর তাঁতীর আত্মা থাকল। আর রাজার আত্মা রইল সেই ল্যাজ-কাটা বাঁদরের ভেতর।

তাঁতীর বহুদিনের সাধ ছিল পরীকে বিয়ে করে। এইবার মনস্কামনা পূর্ণ হল। রাজার দেহধারী তাঁতী উঠে চলল রাজবাড়ি। সেখান থেকে সরাসরি চলে গেল পরীর কাছে। পরীও যথারীতি রাজাকে আপ্যায়ন করে অন্দরে নিয়ে গেল।

এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর, পরীর কেমন সন্দেহ হল। রাজা তো এরকম ব্যবহার আমার সঙ্গে করতেন না! এর কথাবার্তা, চলন-বলন সবই বিপরীত। তখন পরী বলে পাঠালে আমার অন্দরে তোমার উপস্থিত প্রবেশ নিষেধ! আমার শরীর খুবই অসুস্থ। পরে যখন খবর পাঠাবো, আসবে।

তাঁতীর মনে সন্দেহ হল, পরী কি তবে ধরতে পেরেছে! তখন মনে মনে এক ফন্দি আঁটল। সেই বেঁড়ে বাঁদরটাকে ধরে এনে মেরে ফেলবো। তা হলে সব ল্যাঠা চুকে যাবে। রাজার আত্মাই আর পৃথিবীতে থাকবে না। দেখি তখন পরী কি করে।

চারিদিকে ঢ্যাঁডরা পিটিয়ে দিলে জঙ্গল থেকে যে বেঁড়ে বাঁদর ধরে এনে দেবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। বাঁদর-ধরা লোক এই খবর পেয়ে এ-দেশ, সে-দেশ থেকে আসতে লাগল। প্রতিদিন জালে করে প্রচুর বাঁদর রাজ-দরবারে আসতে লাগল। তাঁতী কোনটাই পছন্দ করে না। বাঁদর-ওলারাও বাঁদর ধরে ধরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু রাজার আর বাঁদর পছন্দ হয় না। এ খবর পরীর কানেও গেল। পরী মনে মনে ভাবল, রাজা বেঁড়ে বাঁদরের খোঁজ করছে কেন? নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। আমার সন্দেহ হয়, রাজার শরীরে রাজার আত্মা নেই। এ সমস্ত তাঁতী বেটার কারসাজি। কিন্তু আত্মা চালনার মন্ত্র ও কি করে জানবে? কি জানি আমি যখন রাজাকে এই প্রক্রিয়া শেখাই, তখন ও গোপনে থেকে শিখে নেয়নি তো? হতে পারে। সেইটেই সম্ভব।

এদিকে রাজদরবারে প্রতিদিন বাঁদরের পাহাড় জমতে লাগল। অবশেষে একদিন সেই বেঁড়ে বাঁদর ধরা পড়ল। রাজা তখন সেই অপরূপ বাঁদরকে হাতির পিঠে করে সারা শহর ঘুরিয়ে প্রজাদের দেখাতে লাগল। পরে তাকে মেরে ফেলবে—এই সিদ্ধান্ত করেছিল।

বাঁদরকে খুব ভালভাবে সাজিয়ে, ধুতি, জামা, চাদর, টুপি, গলায় মালা পরিয়ে ঢাক বাদ্যি বাজিয়ে সারা শহরে ঘোরাতে লাগল। সেই হাতী যখন পরী-মহলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, 'পরী তখন জানালা খুলে দেখছিল। বাঁদরেরও জানালায় পরীকে দেখে ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। পরী তখনই বুঝে ফেলল এর ভেতরই নিশ্চয় রাজার আত্মা আছে, নচেৎ আমাকে দেখে চোখ দিয়ে অমনভাবে জল পড়বে কেন?

পরীর কাছে এক টিয়াপাখি ও ছাগল থাকতো। সে তৎক্ষণাৎ দাঁড় থেকে টিয়া-পাখিটাকে নিয়ে তার মুণ্ডুটা মুচড়ে দিল। টিয়াপাখি মরে গেল। অমনি পরী মন্ত্র পড়ে বাঁদরের আত্মাটা টিয়াপাখির ভেতর নিয়ে এল। বাঁদর মরে গেল, টিয়াপাখি বেঁচে উঠল। এখন রাজার আত্মা টিয়াপাখির ভেতর এল।

এদিকে হঠাৎ বাঁদর মরে যাওয়াতে চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। যথাকালে মরা বাঁদরটিকে রাজার কাছে নিয়ে আসা হল। তাঁতী দেখলো ঠিকই মরে গেছে। যাক্‌গে, নিজের থেকে মরে গেছে, ভালই হয়েছে। মারতেই তো হতো! তাঁতীও নিশ্চিন্দি হল।

পরদিন পরী রাজাকে ডেকে পাঠাল। এইবার আমার অন্দরে এসো। আমার শরীর এখন সুস্থ। অনেকদিন তোমার সাক্ষাৎ না পাওয়াতে চিন্তিত আছি।

রাজারূপী তাঁতী খুব খুশী হল। পরী ডেকেছে? ডাকতেই হবে! যাবে কোথা? আর তো রাজার আশা নেই! খুব ভাল করে সেজে-গুজে, গোঁফে আতর লাগিয়ে পরীদর্শনে চলল।

তাঁতী আসতেই পরী খুব আনন্দ করে অন্দরে নিয়ে এল। উভয়ের কুশল প্রশ্ন হল। তার পর বাঁদরের কথা উঠল। অকস্মাৎ বাঁদরের মৃত্যুতে পরী শোক প্রকাশ

করল। তারপর চোখে কাপড় দিয়ে খুব কপট কান্না কাঁদল। তাঁতী বোঝাতে লাগল, আর কেঁদে কী করবে? যদি তোমার দরকার হয় তো খুব ভাল বাঁদর এনে দোব। পরী বলল, 'বাঁদরের শোকে কাঁদছি না।' তাঁতী বলল, 'তবে?' পরী বলল, 'আমার এক পোষা ছাগল ছিল, বড় আদরের। সে হঠাৎ মারা যাওয়াতে আমার মন বড্ড খারাপ হয়েছে। আমি তোমাকে যে আত্মা চালনার মন্ত্র শিখিয়েছিলুম, মনে আছে? না ভুলে গেছ?' তাঁতী বললে, 'নিশ্চয়ই মনে আছে। ভুলবো কেন?' পরী বললো, 'তবে এই ছাগলটাকে বাঁচাও দিকিনি? দেখি পরীক্ষায় পাস করো কিনা।'

তাঁতী অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভেবেই, চাদর মুড়ি দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে মন্ত্র পড়ল। তাঁতীর আত্মা ছাগলের ভেতর চলে গেল। রাজার মৃত শরীর পড়ে থাকল। পরী তৎক্ষণাৎ মন্ত্র পড়ে টিয়াপাখির ভেতর থেকে রাজার আত্মা নিয়ে রাজার দেহমধ্যে প্রবেশ করাল। রাজা বেঁচে উঠলেন। টিয়াপাখি মরে গেল। আর তাঁতীর আত্মা ছাগলের ভেতর গেল। ছাগল বেঁচে উঠল। পরী তৎক্ষণাৎ তরোয়াল দিয়ে ছাগলের মুণ্ডু কেটে ফেলল। তাঁতীর আত্মা চিরদিনের জন্য চলে গেল।

সাধু শিষ্যকে বললেন, বুঝলি বেটা। রাজ-দরবারে যে ছাগলের মুণ্ডুটা দেখেছিস, সেটা সেই ছাগলের মুণ্ডু, এখনও ঝোলানো আছে। যখন তাঁতীর মনে পড়ে পরীকে নিয়ে কি সুখেই ছিলাম, তখন কাটা মুণ্ডুটা হাসে; আর যখন মনে হয় তার এই পরিণতি তখন ঐ মুণ্ডুটা কাঁদে। বুঝলি বেটা? এই জন্যেই বলেছিলুম, শহরে যাচ্ছ যাও, যে জিনিস বুঝতে না পারবে, আর এগোবে না। ফিরে এসো।

বল তো দেখি

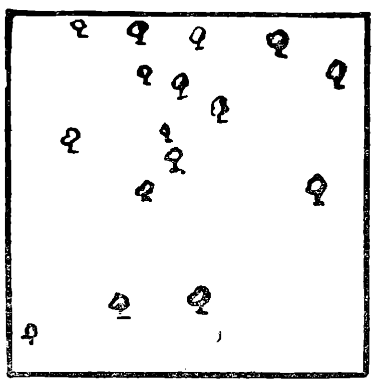

একটি লোকের একটা বিরাট চৌকনা বাগান ছিল। বাগানটা পাঁচিলে ঘেরা। এই বাগানে ১৬টি আমগাছ বসান ছিল। কিভাবে গাছগুলি লাগান ছিল ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে।

লোকটির হঠাৎ খেয়াল হল পাঁচটি সরল রেখায় বাগানটি এমন করে পাঁচিল দিয়ে ভাগ করে ফেলবেন যে প্রতি গাছটি আলাদা আলাদা পাঁচিল ঘেরা স্থানে থেকে যাবে। পেনসিল দিয়ে দাঁড়ি টেনে দেখ তো এ করা যায় কিনা? না পারলে ৫৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

অদ্রীশ বর্ধন

এ কাহিনীকে সত্যি কাহিনী বললে টিটকিরি শুনতে হবে। তার চাইতে বরং বিচিত্র কাহিনী বলা যাক। অথবা আজগুবী কাহিনী।

ছোটনাগপুরের জঙ্গলে এমন অনেক অঞ্চল আছে, যা এখনো দুর্গম। এমন অনেক পাহাড় আছে, যা এখনো অজ্ঞাত। বেলুন পাহাড় তেমনি একটা পাহাড়।

বিচিত্র গড়নের পাহাড়। ঠিক যেন একটা বাটি। বাটির গোলাকার কিনারা হল পাহাড়ের চূড়া। বাটির ভেতরে গভীর জঙ্গল। সেখানে রক্তপলাশের আগুন-হাসি আর মহুয়ার মাতাল-করা বন্যা। লতায় পাতায় সে অরণ্য এত নিবিড় যে পাহাড়-চূড়া থেকে দেখলেই জঙ্গলে প্রবেশের আর সাধ থাকে না। মাঝে মাঝে শোনা যায় ধনেশ পাখীর ডাক। সম্বর হরিণের রব।

পাহাড়ী অঞ্চলে কত পাহাড়ই না থাকে। নাম থাকে না কারো। এ পাহাড়েরও নাম ছিল না। কিন্তু একদিন এমন একট ঘটনা ঘটল যে রাতারাতি একটা নাম অর্জন করে বসল অখ্যাত সেই পাহাড়।

চাঁদনী রাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মায়াময় হয়ে উঠেছে গহন অরণ্য। বনজ্যোৎস্নার এ রূপ যে না দেখেছে, সে কল্পনা করতে পারবে না।

সাঁওতালদের প্রাণে পুলক জেগেছে চাঁদের আলোয়। আকণ্ঠ মহুয়া খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়েছে ছেলে বুড়ো মেয়ে। হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করেছে গাঁয়ের চত্বরে।

সেইসঙ্গে বাজছে মাদল—দ্রিমি—দ্রিমি—দ্রিমি। চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে ওদের কালো কষ্টিপাথরের মত অঙ্গ বেয়ে। ওরা ঝকঝকে দাঁতে হাসছে, নেশায় আবিল স্বরে গাইছে আর স্খলিত চরণে নাচছে।

ঠিক এমনি সময়ে তারার চুমকি বসানো ঝিকিমিকি আকাশে দেখা গেল একটা বিচিত্র নক্ষত্র। অগুন্তি নক্ষত্রের মধ্যে থেকেও এ যেন অন্য জাতের নক্ষত্র। কারণ এর গতি আছে।

ঝিকমিকে তারার মতই এককণা একটা বস্তু। অথচ তারা নয়। তারা মিটমিট করে, কিন্তু সরে সরে যায় না। উল্কাও নয়। উল্কা হলে চক্ষের নিমেষে খসে পড়ে আকাশপথে।

কিন্তু আশ্চর্য এই বস্তুটি অতি ধীর গতিতে নড়ে নড়ে নামছিল নীচের দিকে। নামছিল বিরামবিহীন ভাবে। এবং মুহূর্তে মুহূর্তে বিপুল হতে বিপুলতর হচ্ছিল তার আয়তন।

প্রথমে যা ছিল হীরের কুচির ঝিকিমিকি, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পরিণত হল হীরের ডেলায়। দেখতে দেখতে আরো বৃহৎ হল তার আকার। এখন আর হীরের ডেলা নয়—যেন একটা হীরের ফানুস।

নাচে মত্ত সাঁওতালদের চোখকেও এবার আর ফাঁকি দেওয়া গেল না। বিস্ফারিত হল ওদের বিহ্বল চক্ষু। কানাকানি হল অস্ফুটকণ্ঠে—"চাঁদ নামছে···চাঁদ নামছে!"

অর্থাৎ আকাশের চাঁদ ধরায় অবতীর্ণ হচ্ছে! কিন্তু তাও তো সত্যি নয়! পূর্ণিমার হাসিখুশী চাঁদ ঐ তো ঝুলছে কালো আকাশে। এ তবে কোন্ চাঁদ? পৃথিবীর আকাশে দু'দুটো চাঁদ কি সম্ভব?

বিশাল বস্তুটা ভাসতে ভাসতে আরও নেমে এল। চাঁদ বলে তো মনে হচ্ছে না! এ তো একটা অতিকায় বল···পেল্লায় বর্তুল···দারুণ ঝকমকে···এমন ঝকমকে যে ঠিকরোনো চন্দ্রকিরণে চোখ যেন ধাঁধিয়ে যেতে চাইছে।

এবার ভয় পেল সাঁওতালের দল। ঝুলে পড়ল চোয়াল। ছুটে গেল নেশা। দু'চোখ চেপে কেউ পড়ল শুয়ে, কেউ হল নতজানু, কেউ দিল চম্পট।

বিশাল বলটা আরো নেমে এল। শব্দহীন ধীর স্থির গতিবেগে ভাসতে লাগল পাহাড়চূড়োয়। চাঁদের আলোয় তার হীরের মত ঝকঝকে আবরণে মনে হল যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

সে যে কত বড় বল তা আন্দাজ করতে গেলে নাকি মাথা ঘুরে যায়। মস্ত মস্ত প্রাচীন শালতরুর একটা ছোটখাট জঙ্গল নাকি অনায়াসে সেঁধিয়ে যেতে পারে বলের উদরে।

গাঁয়ের মোড়ল হাঁ হয়ে দেখছিল ভাসন্ত বলের আলোময় চেহারা। কিন্তু বেশীক্ষণ দেখতে হল না। আচম্বিতে রং পালটাতে লাগল সাদা বলের। দেখতে দেখতে সিঁদুরে

হয়ে গেল ভাসন্ত গোলা। রক্তের মত টকটকে সেই রং দেখে রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল মোড়ল বেচারার। বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে বন্ধ করেছিল চোখ।

চোখ খুলেছিল সেকেণ্ড কয়েক পরেই। খুলে দেখেছিল উধাও হয়ে গিয়েছে রক্তাক্ত বল। আকাশ ফাঁকা।

সেই থেকে পাহাড়টার নাম হয়ে গেল বেলুন পাহাড়। মোড়ল লোকটা নিরক্ষর নয়। পেটে বিদ্যে ছিল কিছু। ফানুস বা বেলুন বলতে কি বোঝায়, তা জানত। পাহাড়চূড়োয় ভৌতিক বেলুনের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান—দুটো ঘটনাই সে মনে রাখতে চেয়েছিল পাহাড়ের নাম বেলুন পাহাড় রেখে।

* * *

সংক্ষেপে, বেলুন পাহাড়ের এই গেল ইতিবৃত্ত। এর পরেই আমরা আসছি মূল কাহিনীতে। সে কাহিনী বেলুন কাহিনীর চাইতেও লোমহর্ষক অবিশ্বাস্য এবং আজগুবী।

কারণ, সবুজ বনশীর্ষ আর ধূসর শিখরদেশের শীর্ষে হীরের ফানুস আবির্ভূত হওয়ার ঠিক এক বছর পরে আর এক চাঁদনী রাতে প্রাণের সমস্ত চিহ্ন মুছে গেল বেলুন পাহাড়ের আশপাশে।

সে রাতেও উল্লাসে মেতেছিল আদিবাসীর দল। বিচিত্র শব্দে উত্তাল বনভূমি ছিল তার সাক্ষী।

আচম্বিতে নিশীথ রাত্রি খান খান হয়ে গিয়েছিল বিকট চিৎকারে। আর্তকণ্ঠের মরণ চেঁচানি একবার নয়—শোনা গিয়েছে বারংবার। বনভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হয়েছে ভয়ার্ত কণ্ঠের কান্না। মুহুর্মুহু ছিন্ন হয়েছে কান্নার রোল—শোনা গিয়েছে অন্যত্র।

শুধু মানুষ কাঁদেনি—কেঁদেছে বনভূমির পশুরাও। তাদের কাতর গজরানিতে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে অরণ্যর নিথরতা।

তারপর এক সময়ে স্তব্ধ হয়েছে কান্নার রোল, মুমূর্ষু গজরানি। শ্মশানের নীরবতা নেমে এসেছে বনভূমির সর্বত্র। মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ধনেশ পাখীর কু-ডাক। আর বিরামবিহীন মর্মর ধ্বনি—প্রাচীন শালবীথির দীর্ঘশ্বাস। কেউ জানতেও পারল না চাঁদনী রাতে লতাপাতার রহস্যময় আবছায়া অন্ধকারে কি অবিশ্বাস্য নাটক অভিনীত হয়ে গেল।

পরের দিন বেলুন পাহাড় ঘিরে কয়েক মাইল পর্যন্ত বনভূমিতে জীবিত প্রাণী একটিও দেখা যায় নি। নিছক মৃত হলেও কথা ছিল। কিন্তু কারা যেন সমস্ত রাত ধরে জঙ্গলের পশু আর মানুষদের নিছক নিধন করেই ক্ষান্ত হয় নি—কুচি কুচি করে কচু কাটা করেছে! খণ্ডবিখণ্ড মৃতদেহ স্তূপাকারে জমে রয়েছে অরণ্যভূমির সর্বত্র!

মানুষ নেই—জানোয়ার নেই। রেহাই পেয়েছে কেবল উড়ন্ত পাখীরা!

রহস্যভেদ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা মাথা ঘামায় নি। কুসংস্কার তাদের অস্থিমজ্জায়। পাইকারী হত্যার পেছনে বেলুন পাহাড়ের ভুতুড়ে বনের যে হাত আছে, তা অনুমান করে তারা আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েছে। পরের দিনই তল্লাট ছেড়ে চম্পট দিয়েছে ঘটিবাটি জরুগরু নিয়ে।

অভিশপ্ত বেলুন পাহাড়ের সানুদেশ সেই থেকেই পরিত্যক্ত। প্রাণের মায়া সবারই আছে। সুতরাং অপদেবতার থান মাড়াতে কেউ আসে নি।

মায়াকাননের মায়া তিমিরাবৃত থেকে যেত যদি না পারমাণবিক কমিশন সার্ভে টীম পাঠাতো সেখানে। সামরিক কারণে একটা গোপন অ্যাটমিক চুল্লী বসাতে হবে গহন অরণ্যে। তাই জমি পর্যবেক্ষণে এসেছিল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি।

এসেই মহা ফ্যাসাদে পড়ল তারা। স্থানীয় অধিবাসীরা শিউরে উঠল কমিটির অভিপ্রায় শুনে। ভুতুড়ে জঙ্গলে পুনর্বসতি? বাসরে! প্রাণ থাকতে নয়।

ফলে, কেউ এল না কমিটির সঙ্গে। কমিটি ব্যঙ্গের হাসি হেসে নিজেরাই প্রবেশ করল রহস্যময় সেই অরণ্যে—প্রাণের চিহ্ন মুছে গিয়েছে যে বনাঞ্চলে দীর্ঘ দিন ধরে। দেখেশুনে হোমরা-চোমরা সদস্যরা ঈষৎ বিচলিত হল। যা রটে, তার কিছু বটে। এই সেদিনও যে অঞ্চল প্রাণের চাঞ্চল্যে মুখরিত ছিল, আজ তা নিষ্প্রাণ কেন? কি আছে রহস্যময় ঐ বেলুন পাহাড়ে? চাঁদনী রাতে উড়ে আসা হীরের ফানুস নিছক মহুয়ার নেশায় দেখা মায়া মরীচিকা, না, সত্য?

অতএব, গোপন রিপোর্ট যথাসময়ে পৌঁছোলো যথাস্থানে। তোলপাড় হল সরকারী মহল। সেখান থেকে কি সূত্রে এবং কার সুপারিশে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রর তলব পড়ল—সে কাহিনী বলতে গেলে সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনাতে হয়।

বেলুন পাহাড়ের ভুতুড়ে রহস্য সমাধানে বৈজ্ঞানিকের তলব পড়েছে শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম, শুধিয়েছিলাম প্রফেসরকে—"আপনি কি ভূতের ওঝা?"

ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে বলেছিলেন প্রফেসর—"না হে দীননাথ, ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। শত্রুদেশের গুপ্তচরদের হাত আছে এ ব্যাপারে সন্দেহ করছে নয়াদিল্লী!"

"তাতেই বা আপনার কি? আপনি কি গুপ্তচর ধরার বিদ্যায় পণ্ডিত?" আমি অসহিষ্ণু।

"দূর! আমাকে ডাকা হচ্ছে ঐ সাদা ফানুসের ধাঁধা সমাধানের জন্য। তুমি যাবে?"

"কেন যাবো না? এ রকম একটা থ্রিলিং ব্যাপার। কিন্তু আপনি হালে পানি পেলে হয়।"

"দেখা যাক" বলে, তোবড়ানো গালে ফের খিকখিক করে হাসলেন প্রফেসর।

হাসি শুনে গভীর ভ্রূকুটি করেছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম, বড় দেমাক হয়েছে বুড়ো। ভূতের মার খেয়ে এবার কেরামতি ঘুচবে তোমার।

নিয়তি অলক্ষ্যে তখন হেসেছিলেন। কেন না, ভূতপ্রেতের চাইতেও কিম্ভূতকিমাকার যাদের সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম, তারা মানুষ নয় সত্যিই। কোন্ লোকের জীব তা এখনো অজ্ঞাত ?

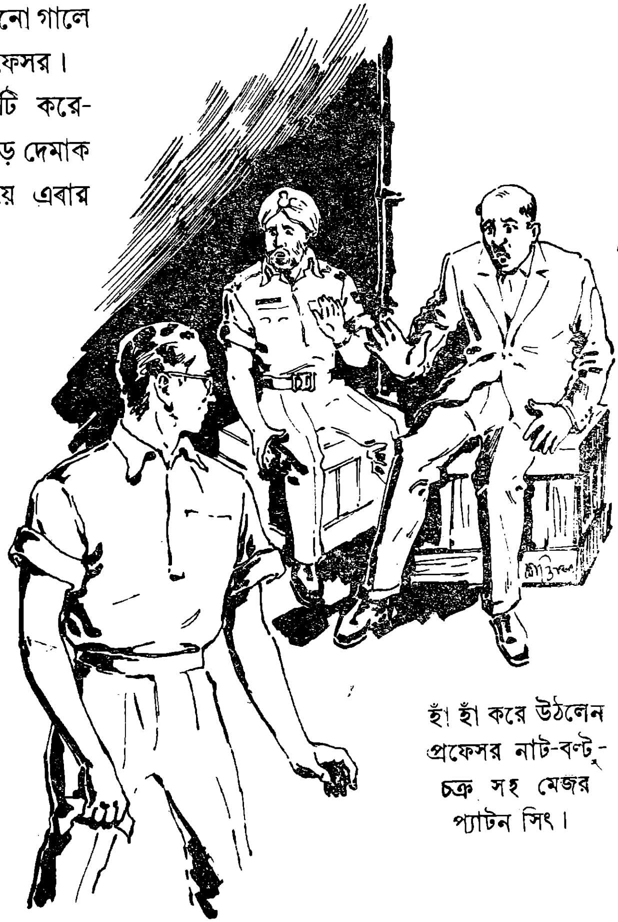

হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র সহ মেজর প্যাটন সিং।

*　　*　　*

সরষে পোড়ায় নাকি ভূত পালায়। কিন্তু সৈন্যসামন্ত ট্যাঙ্ক কামান নিয়ে ভূতের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার নজীর কোনোদিন শুনিনি। দেখলাম সেই প্রথম। দেখে তো চক্ষু কপালে উঠল আমার।

সে কী এলাহি কাণ্ড ! দূরে দেখা যাচ্ছে বেলুন পাহাড়। নীল আকাশের মাঝে তার উন্নত শীর্ষ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিপদের ছায়াও তো কোথাও দেখলাম না।

অথচ, বেলুন পাহাড় থেকে বহু দূরে ঘাঁটি গেড়েছে সামরিক বাহিনী। গিজগিজ করছে মিলিটারী বনের সর্বত্র। নিষিদ্ধ অরণ্য অঞ্চল তফাতে রেখে তারা ঘিরে রয়েছে গোটা বেলুন পাহাড়। ওত পেতে বসে আছে অহোরাত্র। কিসের প্রতীক্ষায়, ঈশ্বর জানেন।

চাঁদের আলোয় যে বনতল এক রাতেই শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে, আমি চেয়েছিলাম তার মধ্যে এক চক্কর ঘুরে আসতে। কিন্তু হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র সহ মেজর প্যাটন সিং। বললেন, "ক্ষেপেছো ?"

"ক্ষেপবো কেন ? ভূতকে আমি পরোয়া করি না। দিনের বেলায় ভূতরা ঘুমোয়।"

"ভূত নয়, ভূত নয়। ভূতের চাইতেও দুঁদে বিপদ। তারা দিনেও জাগে।"

"কারা ?"

নিগূঢ় হাসলেন প্রফেসর—"দেখাই যাক না।"

* * *

দেখা গেল সেইদিনই দুপুরবেলা। স্বচক্ষে না দেখলে সে দৃশ্য বিশ্বাস করা যায় না।

বেলুন পাহাড়ের ভেতরে কি রহস্য নিহিত রয়েছে, তা দেখার জন্যে একটা সামরিক হেলিকপটার উড়েছিল আকাশে। সুপ্রাচীন শালতরুর শীর্ষে বনবন করে ঘুরছিল হেলিকপটারের চাকা। অরণ্যের মাথা দিয়ে দূর হতে দূরে ভেসে যাচ্ছিল ঘুরন্ত প্রপেলারের নিনাদ।

আমি সকৌতুকে দেখছিলাম এদের বিপুল প্রচেষ্টা। মশা মারতে কেউ কামান দাগে না। কিন্তু এঁরা দেখছি তারও এক কাঠি ওপরে যায়। হেলিকপটার, কামান, ট্যাঙ্ক নিয়ে এসেছেন ভুতুড়ে পাহাড়-বনের দখল নিতে।

তখন কি ছাই জানতাম, সামরিক বাহিনীর গোপন রিপোর্ট কতখানি ভয়াবহ। ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো নয়, গুপ্তচর-অন্তর্ঘাতী নয়—তার চাইতেও সাংঘাতিক।

টের পেলাম একটু পরেই। ঠিক যখন উড়ন্ত চাকতি-বোমার বিস্ফোরণে নিমেষমধ্যে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল অতবড় হেলিকপটারটা!

* * *

ঘটনাটা ঘটল ঠিক এই ভাবে।

শালতরুর মাথা দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক ফড়িংয়ের মত স্বচ্ছন্দে উড়ে গেল আকাশযান। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এল তার আকৃতি। ছোট হতে হতে যখন বিন্দুর মত হয়ে এল, তখন আমরা বার করলাম দূরবীন। পেছনের পটে নীল আকাশের বুকে বেলুন পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বিশাল গঙ্গাফড়িংয়ের মত উড়ন্ত হেলিকপটার পৌঁছোলো পাহাড়চূড়োয়।

আমরা রেডিও খুলে বসে আছি। ব্যবস্থা হয়েছে, চালক একাধারে তিনটি কাজ করবে। হেলিকপটার চালু রাখবে, ক্যামেরায় ছবি তুলবে এবং ট্রান্সমিটারে অনর্গল বলে যাবে চোখের সামনে কি দেখছে।

কিন্তু পাহাড়চূড়োয় পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটি কাজের কোনোটিই করা গেল না। কেন না, আচম্বিতে বেলুন পাহাড়ের অভ্যন্তর থেকে শূন্যে উড়ে এল একটা বিচিত্র বস্তু।

উড়ন্ত পিরিচ! ফ্লাইং সসার!

দূরবীনের কাচে আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম সেই আষাঢ়ে দৃশ্য! ফ্লাইং সসার! এত দিন

যার গালগল্প বিস্তর শুনেছি—স্বচক্ষে বহুদূর থেকেই দেখলাম সেই উড়ন্ত পিরিচের ঘূর্ণ্যমান আকৃতি। প্রখর রোদে সোজা হেলিকপটারের দিকে ধেয়ে গেল পিরিচ।

এবং সবেগে আছড়ে পড়ল হেলিকপটারের ওপর।

নিমেষে ঘটল বিস্ফোরণ। প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ। থরথর করে কেঁপে উঠল সমগ্র বনভূমি। বিস্ফোরণের শব্দ খানিক পরে ভেসে এলেও সেই মুহূর্তে দেখলাম ব্যাঙের ছাতার মত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে বেলুন পাহাড়ের শীর্ষে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওয়ায় উড়ে গেল তাল তাল ধোঁয়া। কিন্তু উড়ন্ত পিরিচ আর হেলিকপটারের কোনো চিহ্ন ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না। দুটো বস্তুই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেছে শূন্যে!

অর্থাৎ উড়ন্ত পিরিচ নিছক পিরিচ নয়—পিরিচ-বোমা!

*　　*　　*

সাজ সাজ রব পড়ে গেল শিবিরে শিবিরে।

বেলুন পাহাড়ের উপকথা তাহলে নিছক কপোলকল্পনা নয়। সাঁওতালদের আষাঢ়ে গল্প নয়। চাঁদনী রাতে ঝকঝকে ফানুসের অবতরণ কাহিনীও মিথ্যে নয়—মহুয়ার নেশায় ভুল দেখা নয়।

কিন্তু ওরা কারা? কাদের উদ্ভাবন এই প্রলয়ংকর পিরিচ-বোমা? কেন তারা ঘাঁটি গেড়েছে বেলুন পাহাড়ের গহনবনে? কি তাদের অভিসন্ধি?

সব চাইতে বড় কথা, রাতারাতি এ-তল্লাটের যাবতীয় প্রাণিহত্যাও কি তাদেরই কুকীর্তি? কিন্তু তার সাক্ষী কোথায়? কেনই বা এই পাইকারী হত্যা? বেলুন পাহাড়ের ভেতরকার বিবর-ঘাঁটি সুদৃঢ় এবং দুর্গম রাখাই কি মূল উদ্দেশ্য? কিন্তু কেন? কি আছে বেলুন পাহাড়ের ভেতরে? ওরা কারা? কি চায়?

শত সহস্র প্রশ্ন সহস্র নাগের মতই পাক দিয়ে ধরল আমাদের চিন্তাধারা। ভূত নয়, প্রেত নয়—স্বচক্ষে দেখা গেল বিজ্ঞানের নবতম বিস্ময় এদের করায়ত্ত। মারাত্মক মারণাস্ত্রে সেজে ওরা বেলুন পাহাড়ের ঘাঁটি আগলাচ্ছে। পাছে কেউ গুটিগুটি পৌঁছে যায় পাহাড়ে, দেখে ফেলে ওদের কীর্তিকলাপ—তাই রাতারাতি দ্বিপদ চতুষ্পদ সমস্ত প্রাণী নিধনেও ওদের অরুচি নেই। শ্মশান বনভূমি আগলাচ্ছে ওদের গুপ্তচক্র। আকাশপথও সুরক্ষিত। তবে কি চম্পট দেওয়াই শ্রেয়ঃ?

সত্যি কথা বলতে কি, আমার সমস্ত বীরত্ব উবে গিয়েছিল চোখের সামনে হেলিকপটারের শূন্যে বিলীন হওয়া দেখে! পিরিচ-বোমার কল্পনাতীত শক্তি আমার নার্ভ নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। মনে মনে ভাবছিলাম, অশরীরী ভূতের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে রাজী আছি। কিন্তু

শরীরী এই বিভীষিকাদের সঙ্গে নয়। পৈতৃক ধড়টাকে কচুকাটা অবস্থায় ছোটনাগপুরের জঙ্গলে ফেলে যাওয়ার চাইতে মানে মানে কেটে পড়াই ভাল।

করতামও তাই। টিটকিরি গায়ে মাখতাম না। পরের দিন ভোরেই লম্বা দিতাম ঘরের দিকে।

কিন্তু রাত পোহানোর আগেই ঘটল নতুন এক বিভীষিকা। যে কোনো পালোয়ানের ধাত ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ভয়াবহ সেই ঘটনা। আমি তো কোন্ ছার!

মানুষ-জন্তু কচুকাটা হওয়ার রহস্য ভেদ করলাম আমি নিজেই—প্রাণটা হাতে নিয়ে।

* * *

রাত হয়েছে। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র অতি গুহ্য মন্ত্রণায় ব্যস্ত সামরিক হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে। আমি আমার শিবিরে বসে হরিনাম জপ করছি। সমগ্র বনভূমি থমথম করছে! সূচীভেদ্য সেই নীরবতার সঙ্গে তুলনা চলে না কোনো কিছুরই। বাতাস নেই—বনমর্মরও নেই।

শ্বাসরোধী সেই স্তব্ধতায় আমারও টুঁটি যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছে। তাই ক্যাম্প খাটে পা তুলিয়ে বসে কম্বল দিয়ে মাথা পর্যন্ত মুড়ে রেখেছি। বেরিয়ে আছে শুধু নাক আর চোখ। মনে মনে হিসেব রাখছি সময়ের। কতক্ষণে ভোর হবে—সেই প্রত্যাশা।

অকস্মাৎ একটা সরসর শব্দ শুনলাম। খুব ক্ষীণ শব্দ। বনের মধ্যে ক্যাম্প খাটিয়ে থাকতে গেলে অমনি শব্দ হামেশাই শুনতে হয়। যারা অভ্যস্ত, তারা চমকায় না। কিন্তু আমি চমকে উঠলাম। ভয়ে কাঠ হয়েছিলাম বলেই সামান্য সরসরানি আমাকে অতটা চমকে দিয়েছিল এবং দিয়েছিল বলেই সে যাত্রা আমি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম।

আর, আমার টুঁটি!

সরসরানির কারণ অনুসন্ধান করতে স্বভাবতই এদিক ওদিক তাকিয়েছিলাম। প্রথমেই চোখ গিয়েছিল তাঁবুর প্রবেশপথের দিকে। সেখানে হারিকেনের ক্ষীণ আলোয় বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। এবার তাকালাম পাশের জমির দিকে। ক্যাম্পখাটের পেছন দিকে। ঘাসের ওপর সামান্য ধুলো ওড়া নজরে পড়ল। তাঁবুর তলা দিয়ে একটা সরল রেখা বরাবর ধুলোর স্তর যে কোনো কারণেই হোক চঞ্চল হয়েছে। তাই সামান্য ধুলো উড়ছে।

ধুলো ওড়ার সরল রেখাটা এসেছে আমার ক্যাম্পখাটের নীচের দিকে।

দেখেই অজানা আতঙ্কে আঁতকে উঠেছিলাম।

আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল কি একটা বস্তু আমার পায়ের গোছ বেয়ে উঠে এসেছিল হাঁটুর ওপর।

চমকে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম আমি। চক্ষের পলকে ক্লেদাক্ত কীটের মত কনকনে ঠাণ্ডা বস্তুটা হাঁটু ছাড়িয়ে উঠে এসেছিল উরুর ওপর পাতা কম্বলের ওপর। সেখান থেকে বুকের ওপর দিয়ে গলার কাছে। এবং পরক্ষণেই ফ্যাঁস করে একটা শব্দ হল।

ঝটিতি হাত চালিয়েছিলাম। হাতের এক ঝটকায় আগন্তুক কীটটি ছিটকে পড়েছিল ক্যাম্পখাটের ওপর।

তৎক্ষণাৎ বিস্ফারিত চোখে দেখেছিলাম দুটি দৃশ্য।

প্রথম, গলার কাছে আমার কম্বল কেটে ফালাফালা হয়ে গেছে। চকিতে বুঝলাম, কম্বল না থাকলে আমার গলার অবস্থা ঐরকম হত। অলক্ষ্য আততায়ীর প্রথম চোট গিয়েছে কম্বলের ওপর দিয়ে।

দ্বিতীয়, ক্যাম্পখাটের ওপর পড়ে একটা বিদঘুটে বস্তু। অনড় নয়—সচল। ছোট্ট একটা ইস্পাতের পিং-পং বলের দুপাশে দুটো ব্লেড লাগালে যা হয়—বিচিত্র বস্তুটা অবিকল তাই। বলটা বনবন করে ঘুরছে—সেই সঙ্গে ঘুরছে দুপাশের ক্ষুরধার ব্লেড। বাঁই বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে ক্যাম্পখাট থেকে এগিয়ে আসছে কিনারার দিকে।

এক পলকে এর বেশী দেখার সাহস আমার হয় নি। ঘুরন্ত ছুরিওলা সচল পিং-পং বলটা একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে—কিন্তু দ্বিতীয়বার আর হবে না। ওর তেড়ে আসার ধরন দেখেই রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল আমার। ঘুরন্ত ঐ ছুরি ফের যদি টুঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

একলাফে গিয়ে পড়েছিলাম তাঁবুর প্রবেশপথের সামনে। সেখান থেকে বেসুরো গলায় বিকট এক চিৎকার ছেড়ে বাইরে।

বাইরে গিয়েই ঠ্যাং দুটো যেন স্ক্রু-আঁটা হয়ে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে। থ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। এ কী দৃশ্য দেখছি আমি?

শিবিরের সামনেই চিৎপটাং হয়ে পড়েছিল শিবির প্রহরী। ধারালো অস্ত্রে ছিন্ন টুঁটি। শুধু তাই নয়। সারা গায়ে পিলপিল করছে অনেকগুলো ঘূর্ণ্যমান পিং-পং বল। শুধু ঘুরছে নয়—ঘুরন্ত ছুরির ঘায়ে খণ্ড খণ্ড করছে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। রক্তে ভেসে গেছে তলার ঘাস।

আমি স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেই দুটো ঘুরন্ত বল লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে ছিটকে এল আমার দিকে। চলার পথে কুচকুচ করে কেটে উড়ে গেল লম্বা লম্বা ঘাস। উড়তে লাগল ধুলো।

আর আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। কালান্তক মৃত্যুদূতদের এগিয়ে আসতে দেখেই ফিরে পেলাম সম্বিৎ। ভাঙা গলায় বুকফাটা বিকট চিৎকার করে ছুটেছিলাম প্রফেসরের মন্ত্রণা শিবিরের দিকে।

পরে শুনেছিলাম আমার সেই ভয়ার্ত চিৎকার নাকি পাগলা-ঘন্টির কাজ করেছিল ভয়ংকর সেই রাতে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, ছুটে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। ঘুরন্ত বলের ঘুরন্ত ছুরিকাঘাতে টুঁটিকাটা এবং কচুকাটা হওয়ার আগেই দেখেছিল শিবির প্রহরীর খণ্ডবিখণ্ড লাশ।

আমার শিবিরটাই ছিল বেলুন পাহাড়ের দিকে প্রথম সারির প্রথমে। তাই প্রথম হানা এই শিবিরেই ঘটেছিল। আমি মরতে মরতে নেহাত পরমায়ু ছিল বলে বেঁচে গিয়েছি স্রেফ কপাল জোরে। কিন্তু বাঁচে নি বেচারী প্রহরী।

ছুটতে ছুটতে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রও এসেছিলেন। বড় বড় সার্চলাইটের আলোয় দিন হয়ে গিয়েছিল সামনের জমি।

ঘুরন্ত বল-বাহিনীকে দেখা গেল ঠিক তখনি। সংখ্যায় কত হবে? হাজার? লক্ষ? নিযুত? কোটি? ধুলোর ঘূর্ণিঝড় তুলে পঙ্গপালের মত ওরা বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে তো আসছেই। আসছে…আসছে…আসছে…!

কি করবে সৈন্যবাহিনী? লড়াই কাদের সঙ্গে। কত বন্দুকের গুলি খরচ করলে এদের রোখা যাবে? কিন্তু একটিও যদি কোনমতে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসে নিমেষে টুঁটি হবে ছিন্ন!

অতএব মেজর বিহ্বল চোখে তাকালেন প্রফেসারের পানে। সময় অতি অল্প। কয়েকটা ঘুরন্ত বল এসে গেছে কয়েক গজের মধ্যে। রিভলবার তুলে ফায়ার করলেন মেজর। একটা বল ভেঙে উড়ে গেল। বাকীগুলো বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো না করে এগিয়ে এলো মেজরের পানে……

"পালান।" চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর। "এগিয়ে যাক শুধু ট্যাঙ্ক!"

সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমার পন্থাই অনুসরণ করতে হল গোটা বাহিনীকে। চম্পট! চম্পট! চম্পট! গোলা বারুদ অস্ত্রশস্ত্র ফেলে টেনে দৌড়! ঝোপঝাড় টপকে খানাখন্দ ডিঙ্গিয়ে শুধু দৌড়! দৌড়! দৌড়! দৌড়!!

তবে হ্যাঁ, সচল দুর্গরা বিপুলরোষে এগিয়ে গিয়েছিল বেলুন পাহাড়ের দিকে। ট্যাঙ্কবাহিনীর অগ্রগতির সামনে পিষ্ট হয়েছিল ঘুরন্ত বলেরা হাজারে হাজারে। এগিয়েছে আর মুহুর্মুহু গোলা নিক্ষেপ করেছে ট্যাঙ্কের দল। গুরু গম্ভীর নির্ঘোষে বারেবারে কেঁপে উঠেছে বনভূমি।

প্রত্যুত্তরে কিন্তু একটি পালটা কামানও গরজায়নি। এমন কি বেলুন পাহাড়ের গোপন বিবর থেকে উড়ন্ত পিরিচ-বোমাও উড়ে আসে নি।

শুধু দেখা গিয়েছিল একটি দৃশ্য।

শেষ দৃশ্য !

আচম্বিতে বেলুন পাহাড়ের চুড়োয় যেন আগুন ধরে গিয়েছিল। টকটকে লাল রঙের আশ্চর্য খেলা শুরু হয়েছিল পাহাড়ের ওপরকার আকাশে বাতাসে। সে এক অবিশ্বাস্য হোলীখেলা !

পরক্ষণেই রক্তবর্ণের অতিকায় একটা গোলক সিধে উঠে এসেছিল শীর্ষ ছাড়িয়ে। শুধু গোলক বললে পুরো বলা হয় না—যেন একটা ক্ষুদে ভূ-গোলক ! পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড ! লোহিত এবং ভয়াল !

দেখতে দেখতে অনেকটা শূন্যে উঠে পড়েছিল অতিকায় গোলক। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল রক্তবর্ণ। সে জায়গায় তারার আলোয় ঝিকমিক করে উঠেছিল হীরের মত উজ্জ্বল সাদা আবরণ।

হীরের ফানুস ! নিরক্ষর সাঁওতালদের কথা তাহলে সত্যি ! উড়ন্ত গোলা দেখে ওরাও হীরের ফানুস নামকরণ করেছিল। যদিও জিনিসটা হীরে নয়—হীরের মত ঝকঝকে কোন ধাতু !

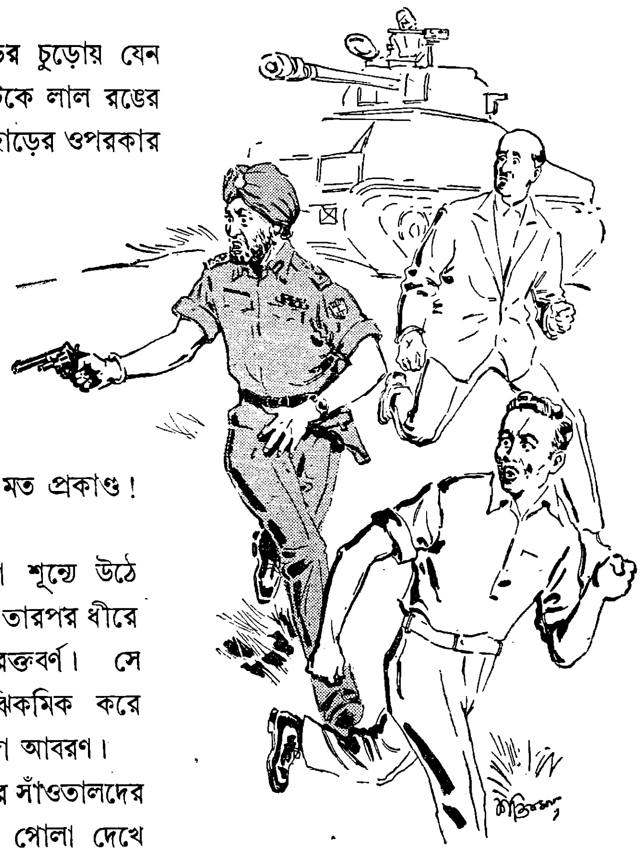

রিভলবার তুলে ফায়ার করলেন মেজর ।
[পৃষ্ঠা ৫৬০

ক্রমশঃ বেগ বাড়ছে ভাসন্ত গোলার। ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে আকৃতি। নিঃশব্দে, কিন্তু অসম্ভব গতিবেগে শ্বেত-গোলক এবার বুঝি তারার রাজ্যে পৌঁছেছে। অগুনতি নক্ষত্রের মাঝে যেন চিকমিক করছে আরও একটি নক্ষত্র।

বেগমান নক্ষত্র—স্থির নয়।

আমরা সবাই হাঁ করে দেখছিলাম—কল্পনাতীত এই দৃশ্য !

প্রফেসর বললেন—"স্পেশশিপ।"

"হ্যাঁ," বললাম আমি—"ব্যোমযান। কিন্তু কোন্ গ্রহের ?"

"জানি না।" বললেন প্রফেসর—"তবে শীগগিরই হয়তো জানবে। কেন না, ওরা আবার আসবে।"

"কি করে জানলেন ?" মেজরের প্রশ্ন।

"ওরা গোপনে প্রস্তুত হচ্ছিল গোপন ঘাঁটিতে। অতর্কিতে আমরা হানা দিয়ে ওদের বিরক্ত করেছি। ওরা নির্বোধ নয়! আমরা প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছি—ওরা খবর পেয়েছে। তবুও ওরা চলে গেল। কেন ? না, ফিরে এসে ওদের উদ্যোগ-পর্বে আবার আমরা বাধা দিতে পারি নতুন করে। সুতরাং—"

"এখনকার মত চম্পট প্রদান। কিন্তু অচিরে বীরবিক্রমে প্রত্যাবর্তন। কেমন, তাই তো ?" বলি আমি। উড়ন্ত গোলার পলায়নে আমার লুপ্ত সাহস ফিরে এসেছিল বলেই রসনায় সুন্দর সুন্দর কথাগুলো এসে গেল।

ফোকলা হেসে প্রফেসর বললেন—"যা বলেছো। তাহলে এবার ফিরে যাওয়া যাক।"

"কোথায় ?"

"অকুস্থলে।"

"কেন ? মরতে ?" সন্ত্রস্ত কণ্ঠ আমার।

"না, না, মরতে কেন ?" অমায়িক কণ্ঠ প্রফেসরের। "ওদের মরণ দেখতে।"

"কাদের মরণ ? কি বলছেন কী ?" মেজর এবার কণ্ঠ চড়ালেন।

"ঐ তো ঐ ঘুরন্ত বলগুলোর", বলে আর দাঁড়ালেন না প্রফেসর। হাঁটা দিলেন ফেলে আসা বনতলের দিকে—যেখানকার জমিতে লাখে লাখে ঘুরন্ত ছুরি হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের টুঁটি।

আমি প্রায় ককিয়ে উঠে বলেছিলাম—"প্রফেসর, আপনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেল ? ওরা যে সাক্ষাৎ মৃত্যু ?"

"তোমার মুণ্ডু। ওরা মৃত্যুর দূত। স্বয়ং মৃত্যু ব্যোমযানে চেপে যখন পলাতক, তখন দূতগুলোর একটা ব্যবস্থা করেই গেছে। দেখাই যাক না ব্যবস্থাটা কি।"

অগত্যা গুটি গুটি যেতে হল আমাদের সকলকেই। যতই এগিয়েছি, ধড়াস ধড়াস করেছে বুক, শুকিয়ে গেছে তালু। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করেছি এই বুঝি শুকনো ঘাসে ধুলো ছিটিয়ে এগিয়ে এল ঘুরন্ত ছুরি···যাদের লক্ষ্য জীবিত প্রাণীর টুঁটি !

টুঁটির ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়েও কিন্তু আমার টুঁটি কাটা যায় নি—এই কাহিনীই তার প্রমাণ। যদিও ওদের ফের দেখেছিলাম। লাখে লাখে দেখেছিলাম। সমগ্র বনস্থল আকীর্ণ হয়েছিল ওদের নিশ্চল দেহে।

হ্যাঁ, নিশ্চল। 'নিস্প্রাণ' শব্দটা প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। কেন না, ওরা কেউ প্রাণীস্থানীয় নয়, যন্ত্র। নিছক যন্ত্র।

লাখে লাখে যান্ত্রিক বলে ছেয়েছিল সারা অরণ্য। জোড়া ছুরি ঘুরিয়ে পাকসাট দিচ্ছিল না একটিও।

একটি বল তুলে নিয়েছিলেন প্রফেসর। দেখেছিলেন বিচিত্র এক ধাতুতে গড়া ওদের দেহ। ফাঁপা বল। বেবাক ফাঁপা। দুপাশে দুটি শাণিত ছুরিকা। শূন্যগর্ভ বলটা কিসের শক্তিতে ঘুরেছে, কার হুকুমে টুঁটি লক্ষ্য করে তাড়া করেছে এবং অকস্মাৎ এখন শক্তিহীন হয়ে কেনই বা লাখে লাখে পড়ে রয়েছে—এ প্রহেলিকা আজও প্রহেলিকাই রয়ে গিয়েছে।

প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র শুধু মাথাই চুলকেছেন—জবাব দিতে পারেন নি। তবে তিনি আজও প্রতীক্ষা করে আছেন।

এ প্রতীক্ষা ওদের ফিরে আসার।

কালের ভাগ্য

ছবিতে দেখা মহিলাটি জাতে আফ্রিকার নিগ্রো নয়, আমেরিকার। নিগ্রোদের উন্নতির প্রচণ্ড অন্তরায় সেদেশে। তবুও মেয়েটির মুখ নির্গত সংগীতে সারা পাশ্চাত্য দেশ মুগ্ধ আর তিনি পৃথিবীবিখ্যাত। আইসেন-হাওয়ারের সময়ে মেয়েটি ইউনাইটেড নেশনের সভ্যাও হয়েছিলেন। বোঝা যাচ্ছে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কালো ও ধলোকে ছাড়াতে পারে। মেয়েটির নাম মেরিয়ান অ্যানডার সন।

প্রকৃতির মাইক্রোফোন

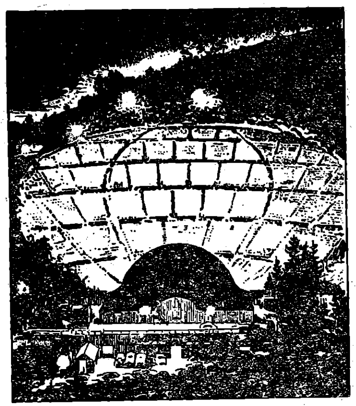

একটা পাহাড়ের অভ্যন্তরে বিরাট উন্মুক্ত বৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চ। এখানে ২০০০০ দর্শকের বসবার স্থান আছে। রঙ্গমঞ্চটি হলিউডে অবস্থিত। এমন ভাবে এটা গড়ে উঠেছে এখানে এক জায়গায় কথা বললে শেষ প্রান্ত অবধি শোনা যায়। মাইক্রোফোনের দরকার হয় না।

শাবাশ উরা!

বাঃ! উরা — চমৎকার!
হুয়া!
ওঃ!

আরও লড়াইএর সাধ আছে নাকি মন্হাপ?
এখনও লড়াই শেষ হয় নি উরা!
এখনও আমি বেঁচে আছি ... উরা! — এখনও লড়াই শেষ হয় নি!
আমি প্রস্তুত মন্হাপ!
আজ তোমার রক্ষা নেই উরা...

উরা ! আজ তোমার রক্ষা নেই — মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও !
তুমি বড় বেশী কথা বলো —

আঃ !

ওরা দু'জনেই মারা পড়বে - তোমরা ওদের ধরো।
না। এটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।
ওরা দু'জনে গড়াতে গড়াতে খাটের তলায় চলে গেল ...
হ্যাঁ জয়ন্ত — কিন্তু খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসবে শুধু একজন!
কি ভয়ানক!

ওটা কার হাত বেরিয়ে আসছে খাটের তলা থেকে ? ও কে ?.. সন্থাপ না উরা ?
কে ? কে ?
ওটা কার হাত ?
সন্থাপ ? — না উরা ?.. ও কে ?..
ওকি ! সন্থাপ !.. উরা তাহলে জীবিত নেই !
খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল সন্থাপ , কিন্তু তার অবস্থা শোচনীয় ...
হ্যাঁ জয়ন্ত — আমি উ-উরাকে হত্যা করেছি ..
কিন্তু আ-আমিও বাঁচব না ... আ-আমার — আমার - ওঃ ! ...
কি হ'ল ? অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি ?
কাছে গিয়ে দ্যাখো বানজা ।

সব শেষ! মন্তাপ বেঁচে নেই।
মরার আগে
ওরা শত্রুকে মেরে মরেছে। এখন তাহলে আমি দলপতি।
প্রফেসর প্রিয়নাথ! ফরমুলা এবার আমার হাতে দিতে হবে... কি! চুপ করে আছেন কেন?
আগেই বলেছি ফরমুলা দেব না —
সাবধান জয়ন্ত!
তোমাদের নখে ধার আছে বটে, কিন্তু আমার ঘুষির জোর দেখেছ তো?
বীরত্ব দেখিয়ে সময় নষ্ট করতে রাজী নই...
পিস্তল!
পিস্তল!
না, কিন্তু পিস্তলের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী অস্ত্র! জয়ন্ত শোনো...

শোনো জয়ন্ত, শুনুন প্রফেসর — আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুণব, তার মধ্যে আপনাদের মনস্থির করতে হবে ... আমি তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের মাথা
মাটির উপর ছিটকে পড়বে! এক! দুই! তি—
লইসা! এখন আমি দলপতি!
উরা বেঁচে আছে! কিন্তু ওর হাতে ওটা কি!... একটা বিদ্যুতের শিখা যেন লইসার হাতের উপর দিয়ে ছুটে গেল!
উরা!
মনে রেখো লইসা এখন আমি দলপতি..
একটুর জন্য আমার হাতটা বেঁচে গেছে! ওঃ! —
চুপ করো আমি যা বলছি শোনো...

আগে আমি ... শোনো...
একি! রবালো এখানে!
হ্যাঁ। আমি পৃথিবীতে এসেছি... ক্রেৎ জাতির সর্বাধিনায়ক সব দিকে নজর রাখে!
বাবা! দ্যাখো! দ্যাখো! ঐ অদ্ভুত যন্ত্রটার গায়ে একটা ছবি ফুটে উঠছে... ছবিটা কথা কইছে!
... তোমরা ভাবছো বিজ্ঞানকে শুধু তোমরাই আয়ত্ত করেছ? কতটুকু জানো তোমরা?
... হয়ে উঠল...
বিজ্ঞান নিয়ে গর্ব করতে লজ্জা করে না? আমার ফরমুলা চুরি করতে তোমরা ছুটে এসেছ মঙ্গলগ্রহ থেকে —
উত্তেজিত প্রিয়নাথ সামনে এগিয়ে এলেন...
প্রফেসর প্রিয়নাথ! ঐ ফরমুলা আমাদের বিশেষ দরকার বটে কিন্তু সেইজন্যে প্রমাণ হয় না যে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ আমাদের চেয়ে উন্নত জীব...
... সঙ্গে তর্ক করতে ... এখন ... প্রফেসর এবং জয়ন্তকে ... দিয়ে ... পরে —
পরে তোমার বিচার হবে। বর্তমানে তুমি দলের নেতা — বন্দীদের পৌঁছে দিয়ে তুমি সবাইকে নিয়ে মঙ্গলগ্রহের দিকে যাত্রা করবে...
ছবি অদৃশ্য হয়ে গেল।
এই আমার আদেশ!

(চলবে)

বিদেশী গল্প

উত্তর মেরু পথে পিয়ারী

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

এ সমুদ্র ত বরফে ঢাকা থাকবার কথা নয়!

সেই ১৯০২ সালে পিয়ারী প্রথম আসেন এখানে। মেরুমণ্ডলের ভিতরে হলেও এ-সাগরের নীল জলে ধূসর আকাশের প্রতিবিম্ব দিনের পর দিন স্পষ্ট দেখা যেত তখন। আজ তা হলে এ-মূর্তি কেন এর?

নিউ সাইবেরিয়ার সমুদ্রস্রোতটা বরফে আকীর্ণ হলেও জাহাজ তাতে চালানো যায়। ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায় বরফের চাঙ্গ, তাদের সঙ্গে ঠোক্কর না খেলেই হল। কোথাও হয়ত এধার থেকে ওধার পর্যন্ত কয়েক মাইলই বরফে ঢাকা, কিন্তু সে একটা পাতলা চাদরমাত্র, তার ভিতর দিয়ে সাহস করে জাহাজ চালিয়ে যাও যদি, বরফের আবরণটা ভেঙে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে তোমায় পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

পথ করে করে সেই স্রোতের সঙ্গে ঠিকই এগিয়ে এসেছেন পিয়ারী। এসব জায়গা তাঁর চেনা। আজ এক যুগ তিনি বিচরণ করছেন মেরু-অঞ্চলে। মেরুর দুশো মাইলের ভিতর এ যাবৎ একা তিনিই প্রবেশ করতে পেরেছেন। ছাড়িয়ে গিয়েছেন এই জ্যাকসন সাগর, যা তখন ছিল মুক্ত, আজ পুরু বরফের তলায় মুখ লুকিয়ে সাদা দাঁত বার করেছে এই নাছোড়বান্দা অভিযাত্রীটাকে বিদ্রূপ করবার জন্য।

পিয়ারীর পরিকল্পনা ছিল জ্যাকসন সাগর পেরিয়ে যাওয়ার। যা তিনি আগেও গিয়েছেন। আজ এই খেয়ালী ডোবাটা বরফের চাদর মুড়ি দিয়েছে বলেই কি সে মতলব বাতিল করে দিয়ে পিয়ারীকে ফিরে যেতে হবে?

সারা পৃথিবী তা হলে বলবে কী? তাঁর নিজের দেশ যুক্তরাষ্ট্রেই বা তিনি মুখ দেখাবেন কেমন করে? আর, সব চেয়ে বড় কথা, সুমেরু কি চিরকালই অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে? মানুষের বিজ্ঞান আর মানুষের উদ্যমকে চিরদিনই কি ব্যর্থ করতে থাকবে প্রকৃতির বাধা?

না, কখনোই না।

"চালাও জাহাজ—" আদেশ দিলেন কমাণ্ডার পিয়ারী।

ইঞ্জিনিয়ার প্রেস্টন একবার মুখ তুলে চাইল কমাণ্ডারের দিকে। কিন্তু প্রতিবাদ? সে কল্পনাই আসে নি তার মাথায়। আদেশ আদেশই। তা অবশ্যই পালনীয়। মুখ নীচু করে সে নীচে চলে গেল।

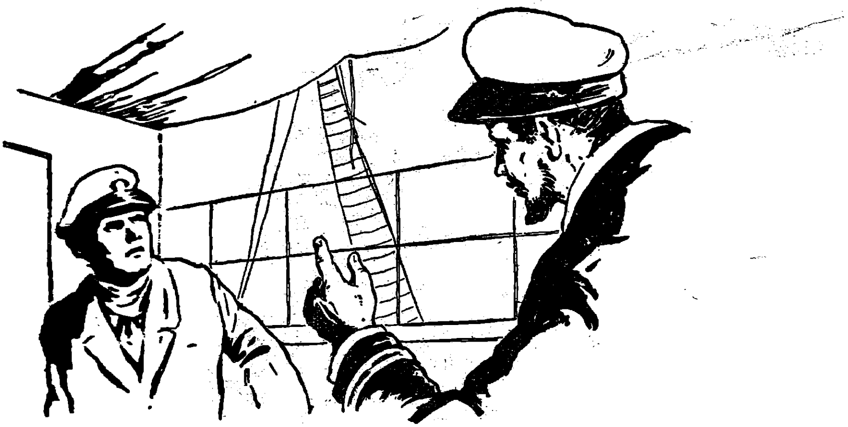

ইঞ্জিনিয়ার প্রেস্টন একবার মুখ তুলে চাইল··· [পৃষ্ঠা ৫৭২

এক পলকের জন্যই চোখোচোখি হয়েছিল কমাণ্ডারে আর ইঞ্জিনিয়ারে। বাক্যবিনিময় আদৌ হয় নি।

কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের অনুচ্চারিত বক্তব্য ঠিকই বুঝেছেন কমাণ্ডার। সে বক্তব্য ছিল এই যে ঠাণ্ডা মেজাজে এতগুলি লোককে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন পিয়ারী, নিজেরও সেই সঙ্গেই অবশ্য।

এই জ্যাকসন সাগর, প্রায় দুইশো মাইল এর বিস্তার। এর শুরুতেই দেখা মিলেছে জমাট বরফের। পুরু আস্তরণ, জলের উপরে তিন ফুট বরফ, নীচে নয় দশ ফুট। অবশ্য অবিচ্ছিন্ন নয় এই সাদা ঢাকনাটা, মাঝে মাঝে চিড় আছে এখানে সেখানে, কষ্টে সৃষ্টে এঁকে বেঁকে জাহাজ চালানো যেতেও পারে সেই সব সর্পিল খাল ধরে ধরে।

কিন্তু এ ত গেল এখনকার কথা। পরে কী হবে? পরে? মেরুর দিকে যত এগুনো যাবে, বরফ ত তত বেশী বেশী পড়বে সমুখে! হয়ত ভাসমান বরফ-ক্ষেত্রটার উচ্চতা তখন তিন ফুটের জায়গায় ত্রিশ ফুট দেখা যাবে। হয়ত এখনকার মত তখন আর চিড় দেখতে পাওয়া যাবে না সেই বরফের রাজ্যে—হয়ত—

কিন্তু আদেশ আদেশই। তর্কের কথা মনে ঠাঁই দেয় না কোন কর্মচারী! মৃত্যু নিশ্চিত জানলেও তার মুখে এগিয়ে যায় দৃঢ় চরণে। বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠলেও যেতেই হয় তাকে।

জাহাজ চলল, প্রথমে "ফর্মিডেবল", পিছনে "সী-হক"।

খাল বেয়ে বেয়ে, এঁকে বেঁকে। সব জায়গায় জাহাজ চলবার মত চওড়া নয় সে খাল।

করাতের সাহায্যে বরফ কেটে কেটে পথ চওড়া করে নিচ্ছে ফর্মিডেবল। এ-করাত জাহাজের গায়েই সংলগ্ন, হাত দিয়ে একে চালাতে হয় না।

কষ্টেস্টে হলেও গোটা দশেক সামুদ্রিক মাইল এইভাবে এগিয়ে গেল জাহাজ দুটো। তারপর দেখা গেল বরফ আস্তরণ ক্রমেই উঁচু থেকে আরও উঁচু হচ্ছে।

যে-খাল বেয়ে আসছিল জাহাজ, ক্রমেই তা চেপে যাচ্ছে দুই দিকে। জাহাজ আর এগুতে পারে না এক ইঞ্চিও। বরফ-কাটা করাত অকেজো হয়ে গিয়েছে, বরফ এখানে এত বেশী পুরু, করাতে তা কাটে না।

ইঞ্জিনিয়ার প্রেস্টন রিপোর্ট দিতে এল।

কিন্তু রিপোর্ট বাহুল্য মাত্র। অবস্থা কি পিয়ারী টের পান নি? পেয়েছেন।

উপায়? জাহাজ ফেরানো?—সে-রকম ইচ্ছা ত পিয়ারীর নেই-ই, থাকলেও সে ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার উপায় নেই কিছু। ঐ সরু নালার ভিতর জাহাজ ঘোরানো যাবে কেমন করে? তা ছাড়াও, আর একটা সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখা দরকার। পিছনের রাস্তা হয়ত এখন আর খোলাও নেই। যেটুকু জল ছিল অনাবৃত, তা হয়ত এতক্ষণ ভেসে-আসা বরফের চাঙ্গড়ে বিলকুল বুজে গিয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার এসে স্যালিউট দিতেই পিয়ারী বললেন—"থামিয়ে দাও জাহাজ। ঐ বরফের মাঠে তাম্বু ফেলব। ঐখানে ঘাঁটি করে স্লেজে এগুবো আমরা—"

স্লেজ? স্লেজ অবশ্য বানানো যেতে পারে, কাঠও জাহাজে আছে, ছুতোরও আছে। কিন্তু স্লেজ টানবে কে বরফের উপর দিয়ে? বলগা হরিণ ত জাহাজে নেই! নেই কুকুরও।

কুকুর মোটে নেই, তা নয়, আছে দুই একটা। কিন্তু যে-সে কুকুর ত আর বরফের উপর দিয়ে স্লেজ টানতে পারে না বেশী দূর। তার জন্য বিশেষ একটা শিক্ষার দরকার আছে।

কিন্তু সে সব প্রশ্ন তুলবে কে? প্রেস্টন নিশ্চয়ই তুলবে না। "সী-হক" জাহাজের কাপ্তেন হাচিনসন তুলতে পারেন, কারণ পিয়ারীর অধস্তন কর্মচারী হলেও তিনিও একটা কাপ্তেন, তা ছাড়া পিয়ারীর বন্ধুও।

জাহাজ থামল। পিলপিল করে দুটো জাহাজ থেকেই নাবিকেরা নামতে লাগল তুষার ক্ষেত্রে। ত্রিশ চল্লিশ ফুট নীচে অবশ্য থই থই করছে জ্যাকসন সাগরের অতল জল, কিন্তু পায়ের অব্যবহিত নীচেটা ত শক্ত বরফ। শক্ত মাটির বদলে শক্ত বরফে পা রাখতে পেরেই নাবিকেরা বেজায় খুশী।

তাম্বু পড়ল বরফের উপর। অনেকগুলো তাম্বু। কাপ্তেন যুগলের জন্য আলাদা দুটো, অধস্তন কর্মচারী লেফটনান্ট মেট স্যারেংদের জন্য গোটা ছয়, সাধারণ নাবিকদের জন্য গোটা কুড়ি—

জাহাজে কেউ থাকবে না। কারণ পিয়ারীর আশঙ্কা—জাহাজ না টিকতে পারে বেশী দিন। বরফের চাপে—

আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেল পরের রাত্রিতেই। ঝড় উঠল একটা। যেমন-তেমন ঝড় নয়, মেরুমণ্ডলের তুষারঝঞ্ঝা। বরফকুচি উড়তে লাগল হাওয়ায়, যে-হাওয়ার বেগ তখন ঘণ্টায় একশো মাইল। তাম্বুর ভিতর বসে বিনিদ্ররজনী যাপন করছে দুশোটা মানুষ, কমাণ্ডার থেকে কুলী পর্যন্ত সবাই।

প্রত্যেকটা তাম্বুর ধারির উপরে ভারী ভারী বরফের চাঙ্গড় চাপানোই ছিল আগে থেকে, যাতে ঝড়ে ওরা উড়ে যেতে না পারে। সেই সব চাঙ্গড়ের পরে বরফ জমছে, আরও, আরও, আরও। না, উড়ে যাবার ভয় নেই, তবে উড়ে-আসা বরফের ভারে ছিঁড়ে না পড়ে তাম্বুগুলো।

গভীর রাত্রে গোটাকতক শব্দ হল—বজ্রনাদের মত। থরথর করে কাঁপতে লাগল গোটা তুষারক্ষেত্রটা। নাবিকেরা যীশুর নাম করে চিৎকার করতে লাগল। তারা ভাবছে—ক্ষেত্রটাই দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে জলের তলায় বিলীন হয়ে যায় বুঝি।

পিয়ারী সেই ঝড়ের মধ্যেই ছুটে বেরুলেন টর্চ নিয়ে। হাডিনসনও এলেন সঙ্গে। যা তাঁরা ভয় করেছিলেন, ঠিক তাই-ই ঘটেছে। দুই ধার থেকে বরফস্তুপ এসে চেপে ধরেছে জাহাজ দুটোকে। সেই বজ্রপেষণে আগাগোড়া ফেটে গিয়েছে দুটো জাহাজই, আর জলের ভিতর থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠে পড়েছে বরফক্ষেত্রের উপরে।

জিনিসপত্র? বেশির ভাগ জিনিস আগেই নামিয়ে আনা হয়েছিল। যা-কিছু পড়েছিল, তাও হয়ত নষ্ট হবে না, যদি না ঝড়ের তাণ্ডবে দুই-আধখানায় বিভক্ত জাহাজ একেবারে এলিয়ে আলাদা হয়ে পড়ে।

সী-হক তাই পড়ল, ফর্মিডেবল পড়ল না! পিয়ারী বললেন—"ক্ষতি কী! জ্বালানির জন্য জাহাজ হয়ত ভাঙতেই হত আমাদের—"

জ্বালানির জন্য। অর্থাৎ পিয়ারি অনেক পরের কথা এখন থেকেই চিন্তা করে রেখেছেন। দুই তিন মাসের মত জ্বালানি মজুদই ত রয়েছে—কয়লা পেট্রল ইত্যাদি। জ্বালানির জন্য জাহাজ ভাঙার দরকার হবে, যদি তিন মাসের ভিতরও এই মেরুরাজ্য ছেড়ে দক্ষিণমুখী পাড়ি না জমানো যায়।

তিন মাস পরে শীত পড়বে প্রচণ্ড। মেরুর শীত। চব্বিশঘণ্টা আগুন জ্বালিয়ে রাখতে না পারলে মানুষগুলো তখন জমে বরফ হয়ে যাবে সবাই।

শীত! মেরুমণ্ডলের শীত ঋতু। একটানা ছয় মাস চলবে তখন সূর্যহীন কালরাত্রি। মাঝে মাঝে মেরুজ্যোতির উদয় যদি হয়, সমগ্র বহিঃপ্রকৃতি সমুদ্র গগন দূর পর্বতের মুখে তা

মাখিয়ে দেবে এক মায়াময় মোহময় আবেদন, যার দিকে তাকিয়ে থাকলে অতি বাস্তববাদী মনও ধীরে ধীরে কোমল, উদাস, ভারাতুর হয়ে আসে।

সেই শীত এখানে যাপন করবার কথা চিন্তা করছেন পিয়ারী। তা নইলে জাহাজ ভেঙে জ্বালানী কাঠের সংস্থান করার কথা ওঠে কেন?

কথা হচ্ছিল দুই কাপ্তেনে। নিকটে অন্য কেউ ছিল বলে পিয়ারীর ত মনে পড়ে না! কিন্তু সেই থেকে বিষয়টা নিয়ে নাবিকমহলে ফুসফুস গুজগুজ শুরু হল। কেমন করে এটা হয়? প্রবাদ আছে, দেওয়ালেরও কান থাকে, কিন্তু এখানে দেয়াল বলতেও ঐ ষাট মাইল দূরের পাহাড় ছাড়া আর কিছু নেই!

হাচিনসনের মুখ থেকে কেউ কিছু শুনেছে, এটা সম্ভবই নয়। তিনি একে দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকারী, তায় গুরুগম্ভীর স্বল্পভাষী লোক। না, তিনি নন। তবে? কে?

ঠিকই আন্দাজ করলেন পিয়ারী, সন্দেহটা আপনা থেকেই জেগেছে নাবিকদের মনে। এ-পরিবেশে না জাগাই আশ্চর্য হত। সবাই জানে যে পিয়ারী এবার শেষ পর্যন্ত দেখবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়েই অভিযানে বেরিয়েছেন। একটা গ্রীষ্মে মেরু পর্যন্ত পৌঁছোনো যে কোন কাপ্তেনের পক্ষেই দুরূহ, তাও জানে সবাই। সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে নাবিকেরা চারই ঠিক দিল। অনুমান করে নিল কমাণ্ডারের চিন্তাধারা কোন্ পথে বইছে।

অনুমান থেকে জল্পনা, জল্পনা থেকে অসন্তোষ—ধিকি ধিকি জ্বলতে শুরু হল একটা চাপা আগুন।

বহুলোক যেখানে একত্র হয়, বিভিন্ন স্থান থেকে এসে, সেখানে সবাই শৃঙ্খলা-পরায়ণ হবে, এটা আশা করা যায় না। জাহাজের উপরে জীবনযাত্রা একরকম, উন্মুক্ত তুষারক্ষেত্রে তাম্বুর তলায় তা অন্যরকম। কাজ কম, ফুরসত বেশী, কে না জানে যে অলস মস্তিষ্কই শয়তানের কারখানা?

কাজ কম, অর্থাৎ বেশির ভাগ লোকেরই কম। যে কয়েকজন ছুতোর কামার আছে দলে, তারা উদয়াস্ত খাটছে। স্লেজ গড়ছে তারা। দুখানা চ্যাপ্টা কাঠ সমান্তরাল ভাবে বরফের উপর পেতে তার উপরে গড়া হয় একখানা শক্ত মাচা। কাঠ দুটোর আগায় থাকে জোয়ালের মত একটা জিনিস। সেই জোয়ালে জুড়ে দেওয়া হয় কুকুর বা হরিণ।

স্লেজ হচ্ছে, তার বাহনের বন্দোবস্ত এখনও নেই। কিন্তু পিয়ারী নিশ্চিন্ত নেই, তিনি বরফের রাজ্যে চারিদিকে চর পাঠাচ্ছেন দলে দলে। তারা শিকারও করবে বটে, কিন্তু তাদের প্রধান কাজ হল—এস্কিমো দেখলে তাদের যেমন করে হোক শিবিরে নিয়ে আসতে হবে, খোসামোদ করে বা লোভ দেখিয়ে বা প্রয়োজন হলে জোর করেও।

শিকার কিছুই বিশেষ হল না, কিন্তু তৃতীয় দিনে নাবিকেরা সত্যিই হাজির করল

একজন এস্কিমোকে। মুখখানি তার পূর্ণচন্দ্রের মত গোল, খুব বেশীরকম লক্ষ্য করে না দেখলে সে মুখে নাকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। গায়ের গোলাপী রং এক ইঞ্চি পুরু ময়লায় পাঁশুটেতে পরিণত হয়েছে—সীল-চামড়ার পোশাক পরে সে এসে পিয়ারির সম্মুখে দাঁড়াল আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি নিয়ে।

করমর্দন করে বিদায় নিলেন পিয়ারী।
[পৃষ্ঠা ৫৭৮

নাম ওর নাকাহুকা, সাদাসিধে হাসিখুশী মানুষ, যেমন সাধারণতঃ হয় সব এস্কিমোরা। একটা বলগা হরিণের পিছনে তাড়া করে করে ঝোঁকের মাথায় এসে পড়েছে এদিকে, তা নইলে এই ওকুরামেরা অঞ্চল ওদের আনাগোনার গণ্ডীর বাইরে। ওকুরামেরা হল এই জ্যাকসন সাগরের আদি ও দেশী নাম।

নাবিকদের মধ্যে পীটার সন এস্কিমো ভাষা জানে একটু আধটু। কাপ্তেন জ্যানসেনের সঙ্গে এসে একবার এক এস্কিমো পল্লীতে তাকে ইগলু-বাস করতে হয়েছিল এক শীতে। ইগলু! মানে বরফ দিয়ে তৈরী গোলাকৃতি ঘর, তার দেয়াল, ছাদ, মেজে সবই বরফ দিয়ে তৈরী, খাড়া দরজা থাকে না তাতে, সুড়ঙ্গপথ থাকে একটা মেজে বরাবর, তাই দিয়ে যাতায়াত।

পীটার সন হল দোভাষী। নাকাহুকার সঙ্গে কথা কয়ে সে পিয়ারীকে জানাল, স্লেজ টানবার জন্য কুকুর ও যোগাড় করে দিতে পারে, আছে ঢের ঢের কুকুর ওদের গাঁয়ে। কিন্তু গাঁ ওদের উত্তর পানে একবেলার পথ। সেখান থেকে কুকুরগুলোকে উলটো দিকে টেনে আনার লাভ কী! তার চেয়ে এটুকু রাস্তা মানুষেই যদি খালি স্লেজ টেনে নিয়ে যায় ত ভাল হয় না কি?

"খালি স্লেজ কেমন? জিনিসপত্র যাবে না? তাম্বু ত নিতেই হবে!" আপত্তি করেন পিয়ারী।

"এটুকু রাস্তা ওরাই নিয়ে যেতে পারে—" নাকাহুকা নাবিকদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

প্রস্তাবটা খারাপ মনে হল না পিয়ারীর। তিনি নাবিকদের সেইরকমই আদেশ দিতে

যাচ্ছিলেন বুঝি, পীটার সল স্যালিউট দিল হঠাৎ। অর্থাৎ, অনুমতি হলে এ সম্পর্কে সে বলতে চায় কিছু। পীটার সলের যা বলবার ছিল, তা সে বলল গোপনে।

বোঝা বওয়া নাবিকদের পক্ষে নতুন কিছু নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তা বইতে বললে অনর্থ ঘটতে পারে। প্রত্যেকটা নাবিকের মনে বারুদ যেন গাদা হয়ে আছে, এ রকম একটা আদেশ এই মুহূর্তে যদি দেওয়া হয়, তবে তা কাজ করবে ঠিক জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির মত। তুচ্ছ ব্যাপার উপলক্ষে একটা বিদ্রোহই ঘটে যেতে পারে।

পিয়ারী একটু ভেবে বললেন—"বিশ্বস্ত কি কেউই নেই?"

"তা থাকবে না কেন? জনা পঞ্চাশ লোক আপনার যে-কোন হুকুম পালন করতে রাজী হবে বলে আমি মনে করি।"

তাদেরই নাম জেনে নিয়ে বেছে বেছে তাদের উপরেই মাল বইবার আদেশ দিলেন পিয়ারী। চারখানা স্লেজ তৈরী হয়েছে, সেগুলি খালিই চলল সাথে সাথে।

বাদবাকী লোক সবই শুকুরামেরা সাগরের উপর বরফ ক্ষেত্রের শিবিরে রয়ে গেল হাচিনসনের তত্ত্বাবধানে। তাদের করণীয় রইল শুধু শিকার। মাংসের ভাণ্ডারটা যতদূর সম্ভব স্ফীত করে তোলা চাই, তা নইলে শীতের দিনে সবাই খাবে কী! তখন ত অবিরাম তুষারঝঞ্ঝায় তাম্বু থেকে বেরুতে পারবে না কেউ!

হাচিনসনের করমর্দন করে বিদায় নিলেন পিয়ারী। দু'জনেরই মনে মনে সন্দেহ এই হয়ত শেষ দেখা। কিন্তু সে সন্দেহের একটু ক্ষীণ আভাসও ফুটে বেরুলো না ওঁদের কথাবার্তায়। "সৌভাগ্য! সাফল্য!"—দু'জনেই শুভেচ্ছা জানালেন দু'জনকে।

এস্কিমো পল্লীতে গিয়ে চল্লিশটা সবল শিক্ষিত কুকুর যোগাড় করা হল। নাকাহুকা সঙ্গে চলল লাফাতে লাফাতে। সাহেবদের সঙ্গে করে আনার দরুন রাতারাতি সে একটা কেউকেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রামে। সাহেব আসা ত সোজা ব্যাপার নয়! ওর অর্থই হল গাদা গাদা উপহার—ছুরি, কাচি, সূচ, সুতো, কফি, রঙিন রুমাল—আরও কত কী দেবদুর্লভ পদার্থ! পল্লীর ইগলুতে ইগলুতে সেদিন গালভরা হাসি আর ডলারের ঝনঝনি। কুকুরের ভাড়া বাবদ প্রায় সবাই নগদ নগদ বেশকিছু পেয়েছে ত!

সমতল বরফক্ষেত্রের উপর দিয়ে স্লেজ ছোটে মসৃণভাবে, উঁচুনীচু পাহাড়ের গা বেয়ে চলে ঠোক্কর খেতে খেতে। মাঝে মাঝে চওড়া চিড় বরফের আস্তরণে। তক্তা আনা হয়েছিল সঙ্গে, তাই দিয়ে দুই মিনিটে পুল তৈরী হয়ে যায়, মাল-সমেত স্লেজে ছুটে বেরিয়ে যায় তার উপর দিয়ে। মানুষগুলি প্রায়ই হেঁটে চলে, ক্বচিৎ কেউ অতিমাত্র অসুস্থ বা শ্রান্ত মনে করলে, তবেই স্লেজে উঠে বসবার হীনতা স্বীকার করতে সে বাধ্য হয়।

রাত্রে তাঁবু পড়ে এমন জায়গায়, যেখানে আকস্মিক তুষার ঝঞ্ঝার আক্রমণ ঘটলেও মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার ভয় নেই। স্থান বাছাই করেন পিয়ারি নিজে, প্রায়ই কোন পাহাড়ের আড়ালে।

অবশেষে সেই একদিন। জ্যাকসন সাগর থেকে যাত্রা শুরুর প্রায় দুইমাস পরে। পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রের তীরে দাঁড়ালেন পিয়ারী। সমুদ্র বটে, কিন্তু যে তুষার-আস্তরণের নীচে চাপা পড়ে আছে সে-সমুদ্র, তা যে কত শো ফুট গভীর, তা হিসাব করার উপায় নেই। এ-তুষার চিরতুষার, চরম শীতের দিনেও যেমন, তথাকথিত গরমের দিনেও তেমনি। কোনদিন এর এক কণা তুষার গলে না কোন উত্তাপে।

এই সমুদ্রই মেরু সমুদ্র।

যন্ত্রপাতি বার করে হিসাব করতে বসলেন পিয়ারী। সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন কয়েক মাইল। তারপর আবার সযত্নে সাবধানে অনেকক্ষণ ধরে হিসাব মিলিয়ে একটা ছোট্ট তুষার ঢিবির উপরে প্রোথিত করলেন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা—"এইখানে! এইখানেই পৃথিবীর উত্তরতম বিন্দু! এই হল সুমেরু!"

পুরো একটা দিন সেইখানে চলল আনন্দোৎসব। তারপর তুষারপ্রোথিত জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করে পিয়ারী ফিরলেন জ্যাকসন সাগরের শিবির পানে।

শীত এসে পড়েছে। যে দেড়শোর মত নাবিক সেখানে বসেছিল হাটিনসনের তাঁবুখানে, তারা আছে ত এখনো? না, পিয়ারীর আশা ছেড়ে দিয়ে ঘরের পথে পা বাড়িয়েছে?

---

৫৫০ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

লোকটি ছবিতে দেখান রেখাগুলির মত করে সরল রেখা টেনেছিল।

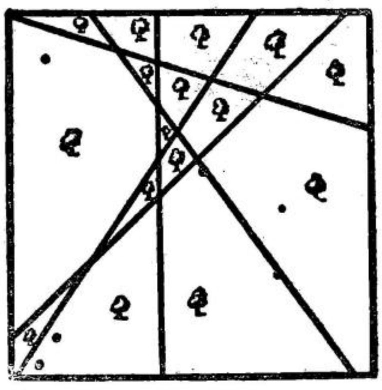

চেরা-কেশরী শঙ্করীপাদ

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

"তমালতালী বনরাজিনীলা, আভাতি-বেলা লবণাম্বুরাশেঃ"—

সেই বেলাভূমিতে একখানি নৌকা এসে ভিড়েছে, সে নৌকা থেকে নামলেন এক প্রৌঢ় পুরুষ, পরিধানে তার বৌদ্ধ ভিক্ষুর ক্ষৌম বসন। মুণ্ডিত মস্তক, নগ্ন পদ। ললাটে মহিমা, নয়নে প্রশান্তি, দেবকান্তি বৈরাগ্যসাধক।

নাম এঁর শঙ্করীপাদ, সুপ্রাচীন চেরা-রাজবংশের অন্যতম সন্তান। প্রথম যৌবনেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে সংসার ত্যাগ করে যান। চলে যান সিংহলে, সেখানে ধর্মগুরু মহাথের পৌলোমীপুত্রের পদপ্রান্তে বসে অধ্যয়ন করেন নিখিল ধর্মশাস্ত্র। তারপরে গুরুর নির্দেশে ব্রতী হন সাগরাম্বরা সিংহলভূমিতে সৎধর্ম প্রচারের মহাব্রতে।

তাঁর পিতৃভূমি দক্ষিণ ভারতে তখন কিন্তু চলেছে এক দানবের তাণ্ডব। বেদপুরাণোক্ত দৈত্যদানবদের চেয়ে এর প্রতাপ কম নয়, তাদের চেয়েও নির্মমতা এর বেশী। নির্মম বলে অখ্যাতি ছিল মথুরাপতি কংসের, কারণ সে সদ্যোজাত ভাগিনেয়দের হত্যা করত বধ্যশিলায় আছাড় মেরে। এ দানব তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে শিশুহত্যার বিলাসে। কংস বেছে বেছে শুধু নিধন করত নিজেরই ভাগিনেয়দের, কারণ দৈববাণী সূত্রে সে জেনেছিল যে, ওদেরই কোন একজনের হাতে থাকবে তার মৃত্যুবাণ। তার নৃশংস আচরণের মূলে ছিল আত্মরক্ষার তাগিদ।

কিন্তু এই মালিক নায়েব? দিল্লী সুলতানের প্রতিনিধি এই গাজী কাফুর? এর নিজের নিরাপত্তা ত কেউ কোন দিক দিয়েই বিপন্ন করেনি! তবু এ সুপরিকল্পিতভাবে

দক্ষিণাত্যে অনুষ্ঠান করে চলেছে অন্তহীন শিশুমার যজ্ঞের। সমর্থ পুরুষদেরও সে রেহাই দেয় না, তা ঠিক। কিন্তু তার প্রধান আক্রোশ হল শিশুদের উপরে। যে জন্মাবে, সেই মরবে তৎক্ষণাৎ। অধিকৃত সব রাজ্যে এই তার অলঙ্ঘ্য ফতোয়া। কোন নারী আসন্ন-প্রসবা হলেই গ্রামের মোড়ল তৎক্ষণাৎ এত্তেলা করবে নিকটতম ফৌজদারের কাছে। ফৌজদার তক্ষুনি জল্লাদ পাঠাবে আঁতুড়ঘর পাহারা দেবার জন্য। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই জল্লাদ তাকে ভবপারে পাঠিয়ে দেবে, অস্ত্রাঘাতেই হোক বা নদীজলে নিক্ষেপ করেই হোক। হিন্দু জাতিটাকেই এইভাবে নির্মূল করবে, এই তার দৃঢ় সংকল্প।

চেরা-রাজবংশে বাতি দিতে কেউ নেই আর। অন্ততঃ তাঁদের পিতৃভূমি কুমারিকা প্রদেশে নেই। কিছু লোক পালিয়ে গিয়েছেন সিংহলে, অজ্ঞাতবাসে দীনদুঃখীর জীবন-যাপন করছেন, আর্থিক সম্বল থাকা সত্ত্বেও। সচ্ছলভাবে থাকতে গেলেই আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হবেন তাঁরা, কাফুর অমনি হয়ত কড়া হুকুম পাঠাবে সিংহলরাজ বলভদ্রের কাছে— ওদের বেঁধে ভারতে ফেরত পাঠাবার জন্য। বলভদ্রের এমন সাহস হবে না যে অগ্রাহ্য করবেন সে হুকুম। খলজি সুলতান ভারতের সার্বভৌম অধীশ্বর আজ, ক্ষুদ্র সিংহলের সাধ্য কে যে তাকে ঘাঁটাবে?

না, সাম্প্রতিককালে চেরা-রাজবংশের যাঁরা পালিয়ে গিয়েছেন সিংহলে, কালাপানির ওপারে বসে তাঁদের পাত্তা পাওয়া দুর্দান্ত মালিক নায়েবের পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু একজনের ঠিকানা পাওয়া সোজা, তিনি ইদানীং যাননি, গিয়েছেন এক যুগ আগে, দক্ষিণ ভারতের আকাশে কাফুর-ধূমকেতুর আবির্ভাবের স্বপ্নও যখন কেউ দেখেনি। তিনি হলেন শঙ্করীপাদ।

শঙ্করীপাদের কথা কাফুর অনেকদিন থেকেই শুনে আসছে। আর্ত-নিপীড়িত জনগণ আক্ষেপ করে তাঁর নাম ধরে এও শুনেছে নরাধম। লোকে বলে শঙ্করীপাদ থাকলে আমাদের এমন দুর্গতি হত না। তিনি তথাগতের আত্মজন, তপোবলেই তিনি কাফুরকে দমন করতে পারতেন। অগস্ত্য ঋষি হজম করে ফেলেননি ইল্বলকে?

লোকের এই কানাকানি কাফুরের কানে ওঠে। ওঠায় সেইসব দেশদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতকেরা, দেশের সর্বনাশ সাধন করে, দেশবাসীকে ঘাতকের খড়্গের সমুখে নিক্ষেপ করে যারা মালিক কাফুরের অনুগ্রহদৃষ্টি ক্রয় করে। কাফুর এসব কথা শোনে, আর জ্বলে জ্বলে ওঠে। মনে মনে ফন্দি আঁটে একটা। এক ঢিলে দুই পাখী মারবে। জনগণের জল্পনাও নিরস্ত করবে, প্রায়বিলুপ্ত চেরা-রাজকুলের অবশিষ্ট বংশতিলক ঐ শঙ্করীপাদকেও নিজের কব্জায় টেনে আনবে।

শঙ্করীপাদ দীর্ঘদিন আগে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাতে কী? কর্তব্য বলে বোঝেন যদি, সন্ন্যাস ছেড়ে ঐ লোকই হয়ত একদিন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হবেন। ইতিহাসে আছে

এমন দৃষ্টান্ত। জীবনের সূচনায় কাফুর ক্রীতদাস ছিল, কিন্তু ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে শিক্ষিত, মার্জিত করে তুলবার চেষ্টা করেছে অনেক। একদিন সে দিল্লীর সুলতানী তখ্‌তে বসবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। লিখতে পড়তে না জানলে, দেশ-বিদেশের খবর না রাখলে রাজ্যশাসনে অসুবিধা হয়, এটা জানা আছে তার। তাই যুদ্ধবিগ্রহে অবিরাম লিপ্ত থেকেও বিদ্যাচর্চা সে যথাসম্ভব করেছে। আর সেই সূত্রেই জেনেছে যে ইওরোপ-খণ্ডের সন্ন্যাসী টেম্প্লারেরা যোদ্ধা ছিল জনে জনে, মুসলিম-কবল থেকে তাদের পুণ্যতীর্থ প্যালেস্টাইন উদ্ধার করবার জন্য বারবার জেহাদ চালিয়েছে তারা, পরিচয় দিয়েছে অতুল বীরত্বের।

কর্তব্য বলে বুঝলে শঙ্করীপাদও যে যুদ্ধ করবে না, এ আশ্বাস কাফুরকে কে দেবে? আর মুসলমান শাসন থেকে দক্ষিণ ভারতকে মুক্ত করাকে কর্তব্য বলে বিবেচনা করবে না ঐ শঙ্করীপাদ, এরই বা নিশ্চয়তা কোথায়? কাফুরের ত মনে হয়, এখানকার বৃত্তান্ত সঠিকভাবে তার কানে যেদিন পৌঁছোবে, সেইদিনই ভিক্ষাপাত্র ফেলে দিয়ে শঙ্করীপাদ তরোয়াল তুলে নেবে হাতে। অতএব এই সম্ভাব্য শত্রুকে আগে থাকতেই নিপাত করা দরকার। যে ফন্দি মাথায় এসেছে কাফুরের, তাতে ও যাবেও নিপাত। সঙ্গে সঙ্গে জনগণ জানবে যে তাদের শেষ ভরসাও নির্মূল হয়েছে, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর দিল্লীর শাসন-নাগপাশ থেকে মুক্তি নেই তাদের। কবরের শান্তি অতঃপর বিরাজ করবে দেশে।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে একদিন ঢোল পিটিয়ে দিল শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে। "কোথায় আছেন চেরারাজবংশধর শঙ্করীপাদ, তিনি এসে একবার সাক্ষাৎ করুন মালিক নায়েব কাফুর গাজীর সঙ্গে। সাক্ষাতের পরেই আমি শাসনযন্ত্র থেকে সব-রকম কঠোরতা এক দিনে তুলে নেব। হত্যা লুণ্ঠন অন্ধকূপে অজ্ঞাতবাস—এসব অতীতের কথায় পরিণত হবে।"

কোথায় দক্ষিণ সিংহলের কোন্ এক অরণ্যঘেরা উপত্যকায় দীনদুঃখী সমাজে তথাগত বুদ্ধের করুণার বাণী বিতরণ করে করে পর্যটনরত ছিলেন ভিক্ষু শঙ্করীপাদ, সেইখানে গিয়ে তাঁর কর্ণে প্রবেশ করল কাফুরের এই ঘোষণার কথা। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আশ্চর্য এবং মর্মাহত। তাঁর জন্মভূমিতে চলছে নাকি এই সব? দিল্লীর শাসন? হত্যা লুণ্ঠন অন্ধকূপে অজ্ঞাতবাস? কী আশ্চর্য! এত দিন শঙ্করীপাদ শোনেননি কেন একথা?

দিল্লীর শাসন! প্রথম যৌবনে যখন তিনি দেশত্যাগ করেন, তখন কুমারিকা প্রদেশে আমদানী হয়নি ও বস্তুর। তখনও পর্যন্ত হিন্দুর দেশ ছিল ওটা। হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন শাস্ত্রবিধি অনুসারে। কোন অত্যাচার অবাধে চলতে পারত না রাজার তরফ থেকে। প্রজার পক্ষ থেকেও কুশাসনের গুরুতর কোন অভিযোগ উঠত না কখনও। লোকনিন্দার ভয়ই যথেষ্ট ছিল—দুষ্কৃতকারী রাজাদের সংযত রাখবার পক্ষে।

দিল্লীর শাসন? চোখে দেখেননি শঙ্করীপাদ, তবে কানে শুনতেন বই কি! সেযুগে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে দিল্লীর শাসন প্রসারিত হয়নি তা ঠিক। কিন্তু কৃষ্ণার তীর পর্যন্ত এসে গিয়েছে সুলতানী পতাকা। বিদ্রাবিত হয়েছে হোয়সল রাজধানী দ্বারসমুদ্র, পহ্লব-রাজধানী কাঞ্চী। হিন্দুসভ্যতার সেই সব পুণ্যপীঠ থেকে তখনই হাওয়ায় ভেসে আসত অমানুষিক নিপীড়নের আর অন্তহীন শোষণের কথা। সমুদ্রতীরের তালীবন ছায়ায় বসে শঙ্করীপাদ কতদিন শিউরে উঠেছেন সে-সব কাহিনী শুনে, ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় অন্তর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে তাঁর।

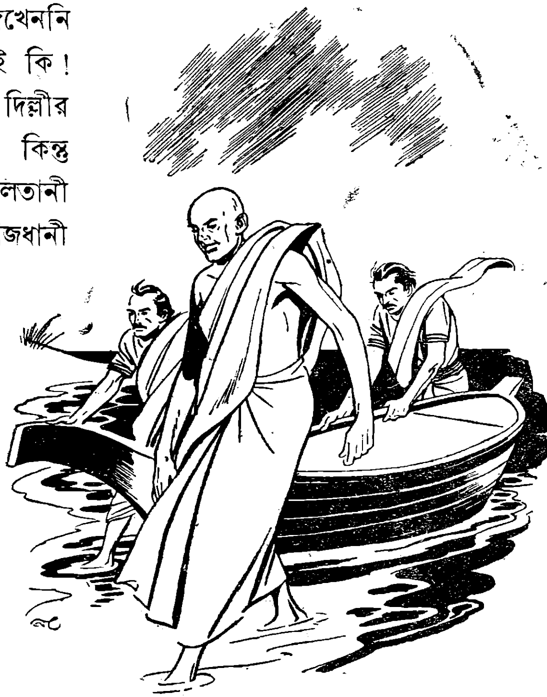

নৌকা থেকে নেমে আসছেন এক সৌম্য সুদর্শন প্রৌঢ় পুরুষ। [পৃষ্ঠা ৫৮৪

সেই পেষণ আর সেই শোষণ এখন চেরাভূমিতেও চলছে? রাজ-বংশ বিলুপ্ত? এবং দিগ্বিজয়ী কাফুর চাইছে তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে? সেই শোষণ আর পেষণের অবসানকল্পে? কেন? তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কিসের জন্য? তিনি ত দেশ-ছাড়া আজ বিশ বৎসর। তিনি যে আছেন, এ কথাই ত তাঁর দেশবাসীর মনে থাকবার কথা নয়! তাঁর উপদেশ বা নির্দেশের এখন কী মূল্য থাকতে পারে জনসাধারণের কাছে?

স্পষ্টতঃই কাফুরের এটা একটা ছল। কী উদ্দেশ্যে এই ছলনার জাল সে বিস্তার করেছে, তা অবশ্য এখানে বসে অনুমান করাও শক্ত, কিন্তু ছলনা ছাড়া অন্য কিছু নিশ্চয়ই নেই এতে! কাফুর যদি বুঝে থাকে যে হত্যার রাজনীতি কোন দেশে চিরদিন চালু রাখা যেতে পারে না, তা হলে তার অবসান ঘটানো শঙ্করীপাদের মত নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ সাপেক্ষ হবে কেন? কাফুরের নিজের একটা কথাতেই ত তা সরাসরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে!

ছল? কেন? শঙ্করীপাদকে হাতে পাওয়ার জন্য? পেয়ে তার কী লাভ হবে? তিনি কোনদিনই চেরা-সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না, তাঁর জ্ঞাতসারে তাঁর পক্ষ থেকে সিংহাসনের উপরে দাবিও কেউ তোলেনি। রাজশক্তি যদি এখন কাফুরের করগত হয়ে থাকে,

তবে কী ভাবে সেই শক্তি সে পরিচালনা করবে, সেটা তার আর তার বিবেকের মধ্যেকার ব্যাপার এখন। পরামর্শ প্রয়োজন হয়, তার প্রজাদের সাথে করুক। চেরা দেশের অধিবাসীরা মূর্খ ছিল না, এখনও নিশ্চয়ই নয়। সমুচিত পরামর্শ কেউ-না-কেউ অবশ্যই দিতে পারবে।

অথচ শঙ্করীপাদই বিশেষ করে আহূত হয়েছেন। তাঁকে না পেলে প্রজাদের প্রতি মানবিক দরদটুকু পর্যন্ত দেখানো সম্ভব হচ্ছে না দিগ্বিজয়ী কাফুরের পক্ষে। ছল নিশ্চয়ই। হাতে পেলেই শঙ্করীপাদকে বন্দী করবে কাফুর। হত্যাই করবে হয়ত! কেন যে করবে তা অবশ্য দুর্বোধ্য। তবু একটা ব্যাখ্যা এর হতে পারে বই কি! খল যে, অন্য কারও প্রশংসা তার সহ্য হয় না। চেরাদেশে হয়ত কিছু লোক ইদানীং শ্রদ্ধার সঙ্গে শঙ্করীপাদের নাম উচ্চারণ করতে শুরু করেছে। করা সম্ভব। ওঁর নিজের কোন কৃতিত্বের দরুন নয়, ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাদের ভক্তি আছে, এই কারণে। ভগবানে ভক্তি থাকলে ভগবৎ-সাধককেও ভক্তি করতে হয়, এ ত জানা কথাই।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। ওদেশে শঙ্করীপাদের জন্য জনসাধারণের রয়েছে ভালোবাসা আর কাফুরের জন্য রয়েছে ঘৃণা। দুটোই যে যার যার কর্মফল, তা তলিয়ে দেখছে না মূর্খ। ভাবছে শঙ্করীপাদকে হত্যা করতে পারলেই লোকসমক্ষে সে প্রমাণ করতে পারবে যে পুণ্যবলের চেয়ে বাহুবল শ্রেষ্ঠ। সে বাহুবল যত নির্মম হবে, তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তত বেশী নিঃসন্দেহ হবে মানুষ। নিশ্চয়ই এই মনোভাবের বশেই ঢ্যাঁডরা পিটিয়ে দিয়েছে কাফুর —"শঙ্করীপাদকে চাই, আসুন শঙ্করীপাদ।"

যাবেন শঙ্করীপাদ! মৃত্যুর আশঙ্কা অতি প্রবল—তা জেনেও যাবেন। মৃত্যুভীতি যে বুদ্ধচরণাশ্রিতকে স্পর্শ করতে পারে না, সেইটি দেখাবার জন্যই তিনি সমুদ্রপারের পরিত্যক্ত জন্মভূমিতে ফিরে যাবেন!

তাই লবণাম্বু সিন্ধুর বেলাভূমিতে আজ একখানি নৌকা এসে ভিড়েছে, সেই নৌকা থেকে নেমে আসছেন এক সৌম্য সুদর্শন প্রৌঢ় পুরুষ। পরিধানে তাঁর বৌদ্ধ ভিক্ষুর ক্ষৌম বসন, মুণ্ডিত মস্তক, নগ্ন পদ। ললাটে তাঁর মহিমা, নয়নে তাঁর প্রশান্তি। একনিষ্ঠ বৈরাগ্যসাধক আজ স্বদেশে ফিরেছেন, লোকহিত কামনায়।

সাক্ষাৎ হতে দেরি হল না। দেশবাসী কেউ জানবার আগেই মালিক নায়েবের কাছে খবর পৌঁছে গেল যে ফাঁদ যার জন্য পাতা হয়েছিল, সে এসে পা দিয়েছে ফাঁদে। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য এল। মোটামুটি সমাদর করেই শঙ্করীপাদকে নিয়ে গেল কাফুরের কাছে। শঙ্করীপাদের কিন্তু মনে হল এ-সমাদর একটা রূঢ় পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। . . .

"আমায় কেন ডেকেছেন?"—প্রশ্ন করলেন শঙ্করীপাদ। দৃষ্টি তাঁর প্রসন্ন, তাতে ভয় বা সন্দেহের কোন ছায়া নেই।

সে দৃষ্টি দেখে কঠোর কাফুরও কেমন অন্যমনা হয়ে পড়ল, কিন্তু মুহূর্তের সে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিতে মুহূর্তকালও লাগল না তার। বিরস কণ্ঠেই জবাব দিল—"ডেকেছি আপনাকে একটা সদুপদেশ দেব বলে—"

"সদুপদেশ ?"—বিস্মিত ভিক্ষু বলে উঠলেন—"অশেষ করুণা আপনার ! কী সদুপদেশ, বলুন—"

"সদুপদেশটা এই যে বৃথা এই মূল্যবান মনুষ্যজন্মটা বাজে খরচ করবেন না ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করে। ওটা ত্যাগ করুন, ইসলামে দীক্ষা নিন। আমি আপনাকে আপনারই পৈত্রিক সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে এদেশ থেকে বিদায় নিই।"

এতখানি স্পর্ধার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না শঙ্করীপাদ। ক্ষণকাল তাঁকে স্তব্ধ হয়ে থাকতে হল মনের চাঞ্চল্য দমন করে আত্মস্থ হওয়ার জন্য। তারপর তিনি বললেন—"আপনি আমাকে তুচ্ছ চের সিংহাসনের প্রলোভন দেখাচ্ছেন। আমি অবশ্য ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে নিজের তুলনা করি না, কিন্তু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে স্বয়ং মার অর্থাৎ পাপ-পুরুষ তথাগতকে প্রলোভন দেখিয়েছিল পৃথিবীর প্রভুত্ব তাঁকে অর্পণ করবে বলে। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।"

"কিন্তু সে প্রত্যাখ্যানের দরুন মার তাঁকে কোন সাজা দেয়নি বুঝি ? আমি কিন্তু মারের মত দয়ালু নই। আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমি যেমন খুশী হব, প্রত্যাখ্যান করলে হব সেই রকমই ক্রুদ্ধ। আর কাফুরের ক্রোধের পরিণাম যে কী হতে পারে, তা সারা ভারতের লোক জানে।"

"সারা ভারতের সব লোককে আপনি দেখেন নি"—মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন শঙ্করীপাদ "ভারতে এমন লোকও আছেন, যাদের উপর ক্রোধ করলে সে ক্রোধ নিষ্ফল হবে আপনার। এ অধমকেও তাদেরই একজন বলে জানবেন।"

"নিষ্ফল হবে ?"—ভদ্র আচরণের মুখোস খুলে ফেলে মুহূর্তে দানব কাফুর আত্মপ্রকাশ করল সংহার মূর্তি নিয়ে। জল্লাদ ডাকবার তর সইল না, কটি থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে তাই দিয়ে শঙ্করীপাদের বাহুতে করল প্রচণ্ড আঘাত। মাথায় বা বুকে নয়! এক মুহূর্তে মেরে ফেলা তার উদ্দেশ্য নয়। মরে যে গেল, তাকে খেলিয়েও আনন্দ পাওয়া গেল না, যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে বশীভূত করে তার দ্বারা কার্যোদ্ধারও করা গেল না। তার চেয়ে অনেক ভাল একটা অঙ্গছেদন করে দেওয়া। তাতে লোকটা সাবধান হতে পারবে, বশ মানবে।

প্রচণ্ড আঘাতই করেছিল দানব, এবং তরবারিও সুতীক্ষ্ণ।

তবু, কী আশ্চর্য ! অনাবৃত গৌর বাহুতে একটা সামান্য আঁচড়ও ত লাগে নি শঙ্করীপাদের ! একটা পালকের কোমল স্পর্শ ই যেন লেগেছে দেহে, এমনিভাবে হাসিমুখে

দাঁড়িয়ে আছেন ভিক্ষু। হাসিমুখেই বটে, তবে সে-হাসি এখন আর প্রসন্নতার হাসি নয়, তার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে একটা অবিমিশ্র তাচ্ছিল্য। দূরাগত মেঘের গুরুগুরু যেন এবার ধ্বনিত হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠে। তিনি বললেন—"মালিক সাহেব! আপনার অনেক চর এদেশে। তারা কেউ কি বলে দেয়নি আপনাকে যে আমি যোগী? "অদাহ্যোহহং অশোষ্যোহহং অচ্ছেদ্যোহ অক্লেদ্য এব চ।" আগুন দিয়ে আমায় পোড়াতে পারবেন না, অস্ত্র দিয়ে আমায় ছেদন করতে পারবেন না, কোন উপায়েই আমায় বশীভূত করতে পারবেন না আপনি। আপনাকে আমার একটা মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে—আপনি এদেশ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত কিনা?"

এর উত্তরে কাফুর—যে চোখ দুটো তার এতক্ষণ বিভীষিকায় নিথর হয়ে ছিল, হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল তা, আর কাফুর ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্করীপাদের উপরে খোলা তরোয়াল উদ্যত করে। তার রক্ষীরা এতক্ষণ একটুখানি দূরে সরে ছিল, দৌড়ে এল তারাও। কিন্তু কাফুরের লাফ এবং তাদের দৌড় সমানই বিফল হল। সবিস্ময়ে তারা দেখল শঙ্করীপাদ যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সে স্থানটা বিলকুল ফাঁকা, কেউ নেই সেখানে।

কেউ নেই। শঙ্করীপাদ অন্তর্ধান করেছেন।

তবে একটা স্বর শোনা গেল ঘরের ভিতরেই—"আমি পর্বতের মত ভারী হতে পারি, আবার তুলোর মত হালকা। আমি মুহূর্তের মধ্যে বায়ুপথে পৃথিবী পরিক্রমা করে আসতে পারি। আমার তুমি কী করবে কাফুর?"

আহত বাঘের মত গর্জন করে সেই স্বর লক্ষ্য করে হাতের তরোয়াল ছুড়ে মারল কাফুর। তরোয়াল ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল মাটিতে। আর হাওয়ার ভিতর থেকে শোনা গেল সেই স্বরই আবার—"তুমি মিষ্ট কথায় ভুলবার পাত্রও নও, কাফুর, অল্পেতে ভয় পাওয়ার মত দুর্বলতাও নেই তোমার অন্তরে। দুর্জয় দানব তুমি। কিন্তু আমিও দানবদলনী তারার* উপাসক আমি। আমায় ডেকে এনে চরম ভুল করেছ তুমি। এদেশ ত্যাগ না করলে তুমি মরবে।"

"কে মারবে? তুমি?"—কাফুরের ভয়ডর নেই, আগের মতই উগ্র কণ্ঠস্বর তার।

"না, মারবে তোমার নিয়তি"—এবার অদৃশ্য শঙ্করীপাদের কণ্ঠস্বরকে শোনাল করুণ, আর্দ্র—"আমি তথাগতের দাস, অহিংসাব্রতী। তোমার মত বিপথগামীর উপরেও আমার মমতা ছাড়া অন্য কিছু নেই।"

সে-কণ্ঠ এইবার নীরব হয়ে গেল। কাফুরের আদেশে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে সৈনিকেরা বহুক্ষণ ধরে হাওয়ার উপরে অস্ত্রের আঘাত হানতে থাকল, এই ধারণার বশে যে অদৃশ্য হলেও ভিক্ষুর দেহ অভেদ্য না হতে পারে। কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা হল তাদের।

* বৌদ্ধদেবী তারা

শঙ্করীপাদকে আর দেখতে পেল না কাফুর।

কাফুর না পাক, চেরাবাসীরা কিন্তু এর পর থেকে ক্রমাগতই দর্শন পেতে থাকল মহাভিক্ষুর। নগরে পল্লীতে, পথে প্রান্তরে, যেখানে সেখানে অকস্মাৎ এক এক সময় আবির্ভাব ঘটে তাঁর, গম্ভীর মধুর কণ্ঠস্বর বাজতে থাকে দেশবাসীকে আহ্বান করে—"আমি শঙ্করীপাদ। শোনো আমার কথা। দেশ থেকে বিতাড়িত কর এই রাক্ষস কাফুরকে। এ পবিত্রভূমিতে ওর দানবীলীলার অবসান হতে বিলম্ব নেই আর।"

হাতের তরোয়াল ছুড়ে মারল কাফুর। [পৃষ্ঠা ৫৮৬

এ শঙ্করীপাদ আর অদৃশ্য নন। সৌম্যসুন্দর ভিক্ষুর নয়নকোণ থেকে স্নেহ ঝরে পড়ে তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে, তারা আশ্বাস লাভ করে তাঁর কথায়, প্রেরণা লাভ করে স্বাধীনতার যুদ্ধ নতুন করে আরম্ভ করবার জন্য। গৃহে গৃহে তিনি দর্শন দেন, শিশুদের আদর করেন, যুবকদের দেন সাহস, বৃদ্ধদের দেন সান্ত্বনা। তাঁর উপস্থিতি যেন সারা দেশের বায়ুমণ্ডলে এক চিরস্থির বিদ্যুৎপ্রভার মত জ্বলছে আর জ্বলছে, ভীরুতা, নীচতা, দুর্বলতা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে প্রতি মানুষের অন্তরে অন্তরে।

কাফুরের সৈন্য আছে তাঁর সন্ধানে। তারা ছোটে একদিকে, শঙ্করীপাদের বাণী শোনা যায় তখন অন্য দিকে। কখনো হয়ত তাঁর দর্শনও পায় তারা, কিন্তু দেখামাত্রই চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাদের, দুই হাতে চোখ ঢেকে দাঁড়াতে হয় তাদের। যখন চোখ মেলে আবার, ভিক্ষু আর নেই সেখানে।

কাফুরের কানের কাছেই ধ্বনি উঠছে—"ওঠো, জাগো দেশবাসী, মুক্ত করো পুণ্যভূমিকে। দানবের ভয়ে জীবনমৃত হয়ে থেকো না আর। সংঘবদ্ধ হও, আক্রমণ কর, বিতাড়িত কর ওকে।"

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কাফুর, উন্মাদের মত আচরণ করে, কিন্তু কী-জানি-কী আতঙ্কে

নিজেকে সংযত করতেও বাধ্য হয়। নিজের অজান্তেই বলে ওঠে এক এক সময়—"থাকুক ও সব। আমার কাজ শাসন করা, বজ্রপেষণে শাসন করেছি এতদিন, করেও যাব চিরদিন। বাড়াবাড়ি আর না-ই বা করলাম।"

কিন্তু বজ্রপেষণ ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে। ভিক্ষুর ভয়ে সৈনিকেরাও এখন তটস্থ! অমানুষিক কিছু দেখলে মানুষ স্বভাবতঃই ভয় পায় তাকে। তা ছাড়াও সারা চেরামণ্ডলে বিদ্রোহের আভাস স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে দিনে দিনে। কখন যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। সবচেয়ে ভয়ানক কথা, দুর্জয় কাফুর এখন যেন আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েই ব্যস্ত, গায়ে-পড়ে হয়ে কোথাও কারও উপরে হামলা করতে সে এখন আর ইচ্ছুক নয় যেন।

অবশেষে একদিন যুদ্ধই বেধে গেল। ছোট একটা সৈন্যদলকে ঘিরে ধরলো সশস্ত্র চেরাবাসীরা, মাতুরার উপকণ্ঠে। মুসলিম সিপাহীরা সভয়ে দেখল—বিদ্রোহীদের পশ্চাতে একটা টিলার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষু. মন্দ্রস্বরে উত্তেজিত করছেন দেশবাসীকে—"কর আক্রমণ, পশুবল বিধ্বস্ত হবেই। জয় তোমাদের নিশ্চিত।"

এদিক থেকে কে একজন দুঃসাহসী সেনানায়ক চেঁচিয়ে উঠল—"তুমি না ভিক্ষু? তুমি না অহিংসাব্রতী? রক্তপাতের নেশায় মাতিয়ে দিচ্ছ মানুষকে. এ তোমার কেমন অহিংসা?" গম্ভীর বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর এল—"পৃথিবীর শান্তি যখন বিপন্ন হয় দানবের অত্যাচারে, তখন দৈবী শক্তিকে অস্ত্রধারণই করতে হয়। নিপীড়িত আর নিপীড়ক দুইয়েরই কল্যাণ হয় তাতে। ও-হিংসা অহিংসারই স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য।"

যুদ্ধ হল নামমাত্র! মুসলমান পক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল অরণ্যের ভিতরে। এর পর দুই একবার কাফুরের নিজ সৈনাপত্যে পরিচালিত সৈন্যদলকেও বিমুখ দেখা গেল অস্ত্রধারণে। কাফুরের এইবার উপলব্ধি হল যে এদেশের মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে সত্যিই, ভয় দেখিয়ে তাদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না।

গুজরাটে নবরাজ্য জয়ের অছিলায় সে তার সৈন্য নিয়ে একদিন ত্যাগ করে গেল চেরামণ্ডল। চেরারাজবংশের এক বালককে খুঁজে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন শঙ্করীপাদ, তারপর ত্যাগ করে গেলেন ভারতভূমি চিরদিনের জন্য। সিংহলে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে তখনো। দেশবাসী কেঁদে বলেছিল—"প্রভু, আপনি যাবেন না, আপনি গেলে আমরা অনাথ হব আবার।" শঙ্করীপাদ তাদের আশ্বাস দিয়ে গেলেন, "বিপদ যদি আবার আসে, নিজেদের হৃদয়ের ভিতর খুঁজলেই আমায় পাবে। আমি চিরদিন আছি, চিরদিন থাকব তোমাদের মধ্যে।"

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

…"বানাকুবা…লুল্লু…সিংজী…

তারপর মেয়েটার দিকে চেয়ে কি যেন বললে। আমি ভাবি যদি কোনো নামে ওকে… আগে বা পিছে…ডাকে।

বুঝলাম যে ওদের ভাষা এতই দুর্বোধ্য যে নাম বলছে কি অন্যকিছু বলছে তা অনুধাবন করা অসম্ভব।

এগিয়ে মাখন সিংকে বললাম—জল খাচ্ছিলাম…তা জল এনে দিল এখানকার এক বুশম্যান সুন্দরী…ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু ও বুঝতে পারলে না…

সর্দারজী বলেন—কী ভাষায় নাম জিজ্ঞাসা করলেন…আপনি তো এখানকার ভাষা জানেন না…

আমি বলি—না জানি না। তাই স্রেফ বাংলা ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম।

সবাই আমার কথায় হেসে ওঠেন।

* * *

আমাদের ক্যাম্পসংলগ্ন বাগানের মধ্যে দিয়ে ক্যাম্পের পিছনদিক পানেই প্রথম পদার্পণ করলাম…

বাগান বললাম, কারণ জঙ্গল হলেও…রাক্কিয়া পাম দিয়ে ক্যাম্পের চারপাশের বনকে অনেকটা বাগানের মত সাজিয়ে তুলেছে।

পেছনের দিকে এগিয়ে দেখলাম যে, যে নদী বেয়ে আমরা এখানে এসেছি…পিছন দিয়ে সেই নদীরস্রোতই প্রবাহিত।

আমরা কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালাম···আমাদের ২০ গজ দূরে জলের মধ্যে দেখলাম চারটি হিপোপটেমাস অর্থাৎ কিবাকো—তাদের সারা অঙ্গ জলে ডুবিয়ে মুখগুলিকে জলের ওপর তুলে আমাদের পানে জুল জুল করে চেয়ে দেখছে···যেন নবাগত অতিথি অভ্যাগতদের চিনে রাখার চেষ্টা। এ প্রচেষ্টা তাদের যতই মনোলোভা হোক হঠাৎ আটকোড়া ফোলা ফোলা চোখের এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের মনকে খুশীর আমেজে ডুবিয়ে দিতে পারল না।

এদের দেখে মনে হচ্ছে যে এরা শুধু নিরালায় একপ্রান্তে জলে ডুব মেরে দু'জনে দু'জনে সৌহার্দ্য সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সময় কাটাচ্ছিল হঠাৎ নবাগতদের আবির্ভাবে হত-চকিত হয়ে পড়েছে··

রাত্রের জ্যোৎস্নায় এরাই আবার হয়ত দুটি সাথী দুটি সাথিনীর সঙ্গে অট্টহাসি হাসবে।

মাখন সিং বললেন—এই স্রোতেরই ওপরে আর একটা স্রোত এসে যোগ দিয়েছে যার মধ্যে আপনি কুমীর পাবেন অগুন্তি···

বলি—কি মানুষখেকো কুমীর না মেছো কুমীর?

মাখন সিং বলেন—মেছো কুমীর কি?

আমি বলি—মেছো কুমীর দেখেননি···মুখগুলো সরু সরু বাকীটা অবশ্য মানুষখেকো কুমীরের মতই। তবে তারা মানুষখেকো নয়, শুধু জলের জীবজন্তুকে উদরস্থ করে। এগুলো কটকের মহানদীতে খুব।

মাখন সিং উত্তর দেন—না, সে রকম কুমীর আফ্রিকায় আপনি পাবেন না, এখানে কুমীর মানেই "ঘরিয়াল" অর্থাৎ মানুষখেকো। তবে আপনি যা বললেন, তা কিন্তু আমি কখনও দেখিনি।

আমি বলি—আমি দেখেছিলাম আমার 'মহুয়া' বই স্যুটিংএর সময় কটক সম্বলপুর জঙ্গলে। এখানে মহানদী চোদ্দ মাইল ধরে পাহাড় ফেড়ে নেমে আসছে···তাই ওখানকার দেশী লোকেরা বলে সাতকোশিয়া গর্জ! অর্থাৎ সাতকোশ বিস্তারিত গর্জ··

সাতকোশিয়া গর্জ জগতে বিখ্যাত বিখ্যাত গর্জের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। শুনেছি রাশিয়াতে ওর চেয়ে ও একটা লম্বা গর্জ আছে।

টিকারপাড়া ঘাটে স্যুটিং করতে গিয়েছিলাম। সেখানে ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীর!

সত্যি, অত কুমীর একসঙ্গে মাছের মত ঘুরে বেড়াতে আর কখনও দেখিনি। বোটে চড়ে মহানদীর স্রোতে গর্জ বেয়ে নেমে আসছিলাম—যেন এই কুমীর সংকুল ভিড়কে ঠেলে ঠেলে। তবে ওখানে সব কুমীরই দেখেছিলাম মেছো কুমীর অর্থাৎ মুখ সরু।

মাখন সিং বললেন—আর ডাঙ্গায় বাঘ কি রকম?

আমি বলি—ডাঙ্গায় বাঘ মানে ·· টিকারপাড়া ঘাট হচ্ছে আঙ্গুল জঙ্গলে অবস্থিত···টিকারপাড়া ঘাটে পৌঁছুতে গেলে পাহাড়ী পাস-এর ভেতর দিয়ে আসতে হয়। আমরা যখন মোটরে চড়ে এগুচ্ছি···হঠাৎ বনের জংলী সাঁওতালরা চিৎকার করে উঠলো···'গেল গেল নিয়ে গেলো' বলে।

মোটর থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার?

লোকগুলো বললে—এখনি একটি লোক সাইকেল চড়ে এই পথে চলেছিল ···হঠাৎ একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার পথের ও পাহাড় থেকে সাইকেলের ওপর লাফ মেরে সাইকেলের লোকটিকে ঘাড়ে ফেলে এ পাহাড়ের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোটর থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার?

পথে দেখলাম তাজা রক্তের চিহ্ন। সাইকেলখানার গা বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে আর সাইকেলখানা যেন জট পাকিয়ে তালগোল হয়ে গেছে। কি সর্বনাশ!

তারপর টিকারপাড়া ঘাটে যখন পৌঁছুলাম···দেখলাম আমাদের থাকবার বাসাটা একটা Treasury ঘরের মত চারিদিকে লোহার রেলিংয়ে ঘেরা।

এই রেলিং ঘেরা ঘরটি পাওয়া গিয়েছিল ফরেস্ট অফিস থেকে। রেঞ্জাররা এলে তাঁরা এইখানেই রাত্রিবাস করেন। এই ঘরেই আমরা আশ্রয় নিলাম।

বলব কি মশাই, সারারাত রেলিংগুলোর বাইরে বাঘের সে কি গজন···ঘরের জানলা দিয়ে দেখি রেলিংএর বাইরে সত্যি এসে দাঁড়িয়েছে শ্রীমান ব্যাঘ্র মহাশয়···রীতিমত রেলিং-এ মুখ রেখে শুঁকে বেড়াচ্ছে।

মাখন সিং বলেন—অনেক রকম শিকার করেছি, কিন্তু আমার বরাতে বেঙ্গল রয়েল টাইগার মারার অবকাশ আর এল না—অথচ জীবনভোর আমার এটা একটা স্বপ্ন!

আমি বলি—ভারতের কোনো জঙ্গলে আপনি কখনও যাননি বুঝি?

মাখন সিং বলেন—না, ভারতীয় হয়েও ভারতের জঙ্গল দর্শন আমার জীবনে হোল না। অথচ শুনেছি···ওখানে কুমায়ুনের নরখাদক বাঘ, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল, হাজারিবাগের বাঘ···কিছুই দেখা হোল না।

আমি বলি—তেমনি এখানে সিংহ, হাতী, গণ্ডার, কিবাকো···সবই তো নিঃশেষ করেছেন ?

মাখন সিং বলেন—রয়েল বেঙ্গল শিকারী না হোলে আর কিবা শিকারী হলাম। সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ নামী শিকারীর পর্যায়ে উঠতে পারে এক গরিলা শিকার করতে পারলে, নেক্‌সট্ হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

আমায় জিজ্ঞেস করেন · আপনি জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি তুলেছেন কখনও ?

আমি বলি—হ্যাঁ ··সে সুযোগ আমি একবারই জীবনে পেয়েছিলাম "মহুয়া" ছবির সুটিং-এর সময়। তবে "আঙুলের" কটক সম্বলপুর জঙ্গলে নয়, উড়িষ্যায় 'তালচর' স্টেটে।

মহারাজা কণিকা আমাদের সহৃদয় বন্ধু ছিলেন, সেই সূত্রে ব্রাহ্মণী আর বৈতরণী নদীতে গিয়েছিলাম কুমীর আর হরিণের ফোটো নিতে। মহারাজা কণিকার স্টেটে ছবি তোলা শেষ হলে মহারাজা কণিকা আমাদের তালচরের রাজার কাছে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তালচরে বাঘের ছবি তোলার জন্যে।

তালচরের মহারাজ আমাদের যথাযথ আপ্যায়িত করে এর সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

বন্দোবস্তটা হচ্ছে···উঁচু একটি মাচান করে আমাদের ক্যামেরা ও ক্যামেরাম্যান ইত্যাদিদের দাঁড় করিয়ে বিডার দিয়ে জঙ্গলে হানা বসিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে বনের বহু জন্তুরই দেখা সামনের খোলা মাঠে একবার করে পেয়েছিলাম।

জঙ্গলের ধারে একটুখানি খোলা চৌকস জমি···যার উপর সূর্যকিরণ প্রায় সারাদিনই থাকে···ছবি তোলার মত উপযুক্ত স্থান। এই জমিটুকুর এক ধারেই মাচান বাঁধা···তার উপর আমরা কজন···কিন্তু বিডারের তাড়া খেয়ে যখন জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারগুলো এসে নিমেষে ছুটে চলে যাচ্ছিল, আমরা হতচকিত হয়ে চেয়ে দেখছিলাম।

শেষে পর্যন্ত রয়েল বেঙ্গল টাইগারও হুংকার দিয়ে এসে সামনের খোলা মাঠে দাঁড়ালো এবং এক নিমেষেই অপর লাফে জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিল···

ক্যামেরা ঘুরে যাচ্ছিল···

ছবি উঠলো।

সারাদিনের কসরতের পর ঘরে ফিরলাম। ক্যামেরাম্যান আমায় নিরালায় ডেকে বললেন—আজকের কোনো ছবিই ওঠেনি···খালি ক্যামেরার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়েছি···

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করি—সেকি হ্যাণ্ডেল যদি ঘুরিয়ে থাকেন তবে ছবি উঠবে না কেন ?

উনি চুপি চুপি আমায় বলেন—ভয়ে ক্যামেরার লেন্স পরানো হয়নি।

মাখন সিং থেকে আমার সঙ্গের সব সাথীই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

হাসি থামলে মাখন সিং বললেন—ক্যামেরার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ছবি তোলা হচ্ছিল মানে সে এক প্রিমিটিভ যুগে বলুন ?

আমি বলি—তা একরকম··কারণ 'মহুয়া' তোলা হয়েছিল ১৯৩০।৩১ সালে···তখন ব্যাটারিতে ক্যামেরা চলতো না···চলতো হাতে ঘুরিয়ে···

মাখন সিং প্রশ্ন করলেন—এবারের ক্যামেরায় লেন্স পরানো হচ্ছে তো···

আবার হাসির হুল্লোড় উঠলো।

সত্যি কথা বলতে কি···আমাদের ভারতে ক্যামেরা বা ছবি তোলার ইকুইপমেণ্ট এত পুয়র যে বিদেশীদের কাছে তার তুলনা হয় না ! হিকায় সুটিং করছিলেন মেট্রো গোণ্ডুইন মায়ার···আমাকে তাঁরা নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন··নিজে চোখে দেখে এলাম··কি হিউজ অ্যারেঞ্জমেণ্ট তাদের। মুভিং লাইট উইথ ডায়নামো···মুভিং লেবরেটরি···প্রোডাকশন ইউনিটের সাজ সরঞ্জাম দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়···সে তুলনায় আমরা যে ছবি তুলছি তা এতই মিগার যে কথায় বলা যায় না···তবু ভারতীয়রা ছবি উঠিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছে এই এক বিস্ময়ের বিস্ময়।

আমরা একপ্রকার ছাগল দিয়ে জব মাড়ানোর কাজ করে চলেছি···বাহাদুরি আছে ভারতীয়দের।

মাখন সিং বলেন—ভারতীদের বুদ্ধির মত যদি কর্মশক্তি এবং কর্ম-সরঞ্জাম থাকতো তাহলে এঁরা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাত হয়ে দাঁড়াতো। আমাদের দোষ হচ্ছে—ও হয়ে যাবে·· যে কোনো রকমে হয়ে যাবে তার বেশী নয়···কি করে পারফেকশনে পৌঁছাবো সেদিকে লক্ষ্য কারোরই প্রায় নেই।

১১

রণমলজী সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় বাসায় ফিরলেন···তখনও কিন্তু পশ্চিমের আকাশে সূর্য অস্ত তো যায়ই নি বরং বেশ জোরদার রৌদ্রে চারদিক ঝলমল করছে।

মাখন সিং তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে আমাদের এক এক করে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমার সঙ্গে আলাপ করে যখন বুঝলেন ছবি তোলার কর্ণধার আমিই, তখন তিনি বললেন—মিঃ বোস, আপনার ছবির সবজেক্টটা কি নিয়ে···টারজানের মত কিছু ?

আমি বলি—না, এই ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়···ভারতীয়দের আফ্রিকা অভিযান।

পৃথিবীতে ভারতীয়রাই সর্বপ্রথম আফ্রিকার বনাঞ্চলে পদার্পণ করেন ব্যবসা করতে…বিশেষ করে গুজরাত প্রদেশের কাথিয়াড়ী বণিকগণ। এঁরা ওদেশ থেকে গন্ধদ্রব্য, রাঁধবার মসলা, লবণ ইত্যাদি নিয়ে এদেশে এসে বাটা সিস্টেমে এদেশ থেকে হাতীর দাঁত, সিংহের নখর ও নানারকম জন্তু জানোয়ারের চামড়া…দামী দামী ধাতু…যেমন সোনা, হীরা, ইউরেনিয়াম, প্লাটিনাম থেকে শুরু করে টিন, ম্যাঙ্গানিজ পর্যন্ত সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন…এবং এর জন্যে অরণ্যসংকুল ভয়াবহ জীবজন্তু, সাপ সরীসৃপাদি, কীটপতঙ্গ, ভীষণ ভীষণ নরখাদক বিভিন্ন জংলী মানুষদের সম্মুখীন হতে হোতো…কত রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করতে হোতো…কত কত নদ-নদী পাহাড়পর্বত অতিক্রম করতে গিয়ে জীবন নিঃশেষ করে এই ব্যবসাসূত্র প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন!…এই পরিপ্রেক্ষিতেই এক ডকুমেণ্টারি ছবি…অথচ ঔপন্যাসিক প্রেমবিরহের মাধ্যমে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

টারজনের মত এতে রূপকথার স্থান নেই।

রণমলজী বলেন—এ কাজ সর্বপ্রথম যখন গুজরাতের কাথিয়াড়ী বণিকরাই করে গেছেন…আমি তাদেরই বংশধর…কাজেই আমার কাছ থেকে যথাসাধ্য সাহায্য আপনারা পাবেন। তবে 'রৈঞ্জুরু'তে আপনারা ঠিক কি ছবি নিতে চান আমায় বলবেন, তার ব্যবস্থা করা যাবে।

বুঝলাম আমরা যে জায়গায় পদার্পণ করেছি তার নাম 'রৈঞ্জুরু'। রৈঞ্জুরু থেকেই বোধহয় রিয়ঞ্জারো পর্বতমালার নামকরণ হয়েছে। রিয়ঞ্জারো পর্বত-পাদদেশে এই জায়গার অবস্থিতি তাই এইখানকার নাম রৈঞ্জুরু হয়েছে।

আমি বললাম—আপনি এই ফিরলেন…কিছুটা সুস্থ হোন তারপর রাত্রে একসঙ্গে বসে আপনাকে আমাদের 'কি কি চাই' এর ফর্দ দেবো।

উনি হাসলেন।

কফি এসে পড়লো। সবাই এক টেবিলে বসে কফি সেবা করা হোল। কফি খেতে খেতে সর্দারজী গুজরাটী ভাষায় রণমলজীর সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলেন। বুঝলাম…ব্যবসা সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছে।

আমি বলি—মিঃ রণমলজী…

উনি কথা কেটে বলেন—আমায় মিস্টার বলবেন না, বলবেন রণমলভাই…

আমি বলি—ও আচ্ছা। আচ্ছা আপনি এখানে এমন নির্বান্ধব পুরীতে থাকেন কি করে? তা ছাড়া আপনার সঙ্গীদের দেখলেই তো ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়।

উনি বলেন—ঠিক এই জায়গাটা হয়ত নির্বান্ধব পুরী, তবে নৌকা করে এলবার্ট লেকের দিকে আরও কিছুটা এগোলেই রয়েছে "ফোর্ট পোরট্যাল"। প্রায় শহর

বলাই চলে। মানুষের জীবনের যাবতীয় দ্রব্যই সেখানে মিলে যায়, তাছাড়া নিঃসঙ্গতাও কিছু কিছু ঘুচে যায়। আমি তো আজ তিনদিন পরে ওখান থেকেই ফিরছি। তারপর বলেন—আপনাদের ফিরতিপথ বোধহয় "ফোর্ট পোরট্যাল" কি বলেন সর্দারজী ?

সর্দারজী উত্তর দেন—"ফোর্ট পোরট্যাল" হয়ে ফেরার ইচ্ছা। নইলে লেক এলবার্টে নেমে যেতে গেলে দশ পনর দিন লেগে যাবে। তা ছাড়া শুধু শুধু এঁদের আর অত কষ্ট দিতেও চাই না।

ফোর্ট পোরট্যাল থেকে ইউগাণ্ডার পথে ফিরে যাবার রাস্তা আছে এবং সে রাস্তা খুবই সুন্দর। তবে বোটে এসেছি, তাই বোটম্যানেরা বোট নিয়ে কোথায় যাবে তাই ভাবছি।

রণমলজী বলেন—বলুন মিঃ বোস কি খাবেন রাত্রে···

রণমলজী বলেন—বোট লেক জর্জের না কাজিঙ্গা চ্যানেলের।

সর্দারজী বলেন—কাজিঙ্গা চ্যানেলের।

—ওঃ তাহলে ওদের আমি ধরে নেবো ফোর্ট পোরট্যাল থেকে। আমার কিছু লগ্ পাঠাবার রয়েছে "বারবারায়"। ফোর্ট পোরট্যালে আপনাদের ছেড়ে দিয়ে লগ্ তুলে নিয়ে ওরা ফিরে যাবে। আর আপনাদের দলকে মনিভাই-এর লরী করে "মরোঙ্গোতে" পাঠিয়ে দেবো। সতের মাইল পথ যাবে আর আসবে।

আমি ভাবছি···এই তো সবে এসে পৌঁছেছি···এরি মধ্যে ফেরার প্রোগ্রাম···তবু রণমলজীর প্রোপোজাল ভালই লাগলো। ভাবলাম নৌকায় ঐসব ডেঞ্জারাস পথ দিয়ে আর ফিরে যাব না।

গত রাত্রের টঙ্কারটা হঠাৎ এসে বুকে যেন ঘা দিয়ে উঠলো। নিজে নিজেই শিউরে উঠলাম!

রণমলজী বলেন—বলুন মিঃ বোস কি খাবেন রাত্রে···আমিষ না নিরামিষ ··

আমি বলি—আপনি গুজরাত প্রদেশীয়, কাজেই নিরামিষাশী নিশ্চয়ই…

উনি উত্তর দেন—জাতিগত সংস্কারে আমাদের তাই উচিত, তবে এই জঙ্গলে সব সংস্কার কি বজায় রেখে চলা যায়…তাই যখন যা সুবিধে হয় তাই খাই…

আমি বলি—আমাদেরও তাই…যা সুবিধামত পাবেন তাই খাওয়াবেন।

উনি বলেন—এখানে জঙ্গল-পটাটো (মেটে আলু) হয়, তাছাড়া ভেণ্ডি, ঝিঙা সবই কিছু কিছু হয় তাই নিরামিষেও অসুবিধা নেই, কিছু কিছু মছলিও পাওয়া যায়, আপনি বাঙ্গালী আছেন মছলি খেতে ভালবাসেন…মছলিও খাওয়াতে পারবো। তবে মান্‌সোটা কাল জঙ্গলে না গেলে টাটকা মান্‌সো মিলবে না তো।

আপ্যায়িতের হাসি হেসে উঠলেন। বললেন,—হ্যাঁ এখানে ফল খুব ভাল আছে…

আমি বলি—কি ফল ?

উনি বলেন—বদ্দি ফল, মাইনে সারা ফল। আম বলুন, আনারস বলুন, কেলা, চিক্কু সবই পাওয়া যায়…তাছাড়া রাফফিয়া আম…মাইনে খেজুরই বলুন…এখানে খুব পাওয়া যায়।

ব্যানার্জি সাহেব বলেন—এ তো দেখছি 'গার্ডেন অফ ইডেন'।

সবারই মুখে মৃদু হাসি।

রণমলজী ওদেশী ভাষায় ডাক দিলেন। ওর পেয়ারের চাকর বুশম্যান সর্দার এসে হাজির হোলো। উনি তাকে কি কি যেন বললেন। সে বহুৎ আচ্ছা বানাকুবা বলে সেলাম জানিয়ে বিদায় নিল।

রণমলজী চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—"নীলাঞ্জী মটোমারু"…

বুশম্যান সর্দার ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—"বহুট্ আচ্ছা বানাকুবা"

আমি ঔৎসুক্য সুরে বলি—নীলাঞ্জী মটোমারু মানে কি রণমল ভাই ?

উনি মৃদু হেসে উত্তর দেন—ওরা মাছ ধরতে যাচ্ছে, এখানে একটি ওদের জাতের মেয়ে থাকে…তার নাম নীলাঞ্জী—তাকেও সঙ্গে নিতে বললাম।

—চলুন পিছনের নদীর পারেই মাছ ধরবে…দেখবেন চলুন।

সবাই উঠে পড়লাম। আমি মনে মনে জংলী মেয়েটার নাম পুনরাবৃত্তি করলাম—নীলাঞ্জী !

(ক্রমশঃ)

* * *

"৺ভুবনমোহন সরকার স্মৃতিসাহিত্য-প্রতিযোগিতা"র
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

জননী

অরুন্ধতী রায়চৌধুরী

লতাপাতায় ঘেরা শান্ত স্নিগ্ধ সবুজ একটি গ্রাম—তার পাশ দিয়েই কুলুকুলু শব্দ করে বয়ে চলেছে ধলেশ্বরী। এই গ্রাম থেকে আজ সব আনন্দ কোলাহল যেন মিলিয়ে গিয়েছে। খবর পাওয়া গিয়েছে খান সেনারা দুর্দান্ত বেগে ছুটে আসছে এই দিকে। রাবেয়া বাড়ির দাওয়ায় বসে চুপচাপ ভাবছে। সন্ধ্যে হয়ে এল প্রায়—ঘরে দেড় বছরের শিশুটা কেঁদে উঠল। বাড়িতে আর কেউ নেই। ছেলের বাপ গেছে মুক্তিযুদ্ধে। পাশের চৌধুরী বাড়ির বড় মেয়ে আমিনা রাত্রে এসে রাবেয়ার কাছে ঘুমোয়।

ছেলেটার কান্না খালি বাড়ছে। তাড়াতাড়ি উঠল রাবেয়া—ঘরে যে কয়েকটা মুড়ি অবশিষ্ট ছিল—তা নিয়ে ঢুকল ঘরে। ছেলেকে কোলে নিয়ে দাওয়ায় বেরিয়ে এল। কিন্তু ছেলে আর মুড়ি খেতে চায় না। তিন দিন ধরে কেবল মুড়ি খেয়েই আছে। ঘরে একমুঠো চাল নেই, নেই এক ফোঁটা দুধ। আশেপাশের সব বাড়িতেই চাল বাড়ন্ত। "এইটুকুন খাইয়া লও বাপ আখতার। তোমার বাপ ফিরিয়া আইলে ভাত রাইন্ধ্যা দিমু, দুধ আনিয়া দিমু।"—রাবেয়া ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু দেড় বছরের ছেলে কিই বা বুঝবে। সে মুড়ির বাটি ঠেলে সরিয়ে দেয়।

হঠাৎ রাবেয়ার কানে একটা কোলাহল ভেসে এল। শক্ত হাতে আখতারকে বুকে জড়িয়ে উৎকন্ঠিত ভাবে রাবেয়া দাওয়া থেকে নেমে আসে। মোড়ের বাড়ির সফিকুলকে দেখে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে সফিকুল বলে, "কি আর হইব, খান সেনারা আইস্যা পড়ছে প্রায়। তাই সকলে গ্রামে ঢুকার সড়কের মুখে গিয়া ভিড় জমাইছে দা বটি নিয়া।" যাবার সময় আরও হেঁকে গেল—"তোমরাও সব তৈরী থাকো গো—ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় আইছে। জিনিস গোছগাছ করিয়া নেও শীগ্‌গির।" রাবেয়া তাড়াতাড়ি চলে এল নিজের ঘরে। ছেলেটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দু'একটা কাপড় আর কয়েকটা রূপোর গয়না যা অবশিষ্ট ছিল, একটা কাপড় বেঁধে নেয়। আর কিই বা আছে তার ঘরে—খড়ের চাল, মাটির ঘর, কয়েকটা কলাই করা বাসন। অবশ্য সাত রাজার ধন মানিক আছে তার ঘরে—তার আখতার। ছেলেকে দিয়ে রাবেয়ার অনেক আশা। দুঃখের দিন পার

হয়ে তবেই তাকে সুখের মধুর সময়ে পৌঁছাতে হবে। তার স্বপ্ন আখতার বড় হবে—অনেক বড়। তার আম্মা ও বাপজানকে সে সুখী করবে। রাবেয়া মনে মনে প্রার্থনা জানায় আল্লার কাছে আখতারের মঙ্গলের জন্য। আল্লার কাছে আরও প্রার্থনা জানায় তার স্বামীর জন্য, তাদের মুজিব ভাইয়ের জন্য।

দরদর করে চোখের জল ঝরছে রাবেয়ার। তার শ্বশুরের ভিটে অবশেষে ত্যাগ করে যেতে হবে। ষোলো বছর বয়সে সে এই বাড়ির বউ হয়ে এসেছে। তার পর চার বছরেরও বেশী কেটে গেছে। এই কয়বছরে তাদের সংসারে কত ওলটপালট ঘটে গেছে। শ্বশুর শাশুড়ী দুই বছরের ব্যবধানে মারা গিয়েছে, ননদের বিয়ে হয়েছে। এবার যুদ্ধ লাগল—স্বামী গেছে মুক্তিযুদ্ধে। কবে ফিরবে—আদৌ ফিরবে কিনা জানে না। না—কিসব ভাবছে সে বসে বসে। ছেলে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে কাঁদতে কাঁদতে। ঘরে লণ্ঠন জ্বালাতে উঠল সে। তারপর চৌধুরীদের বাড়িতে একবার যাবে। একা একা এই বাড়ি ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। চৌধুরীরা যদি যায়, তবে তাদের সঙ্গে যাবে।

হঠাৎ বাইরে থেকে আমিনার ডাক শোনা যায়—"ও দিদি, শীগ্‌গির আস।" রাবেয়া তাড়াতাড়ি দাওয়ায় বেরিয়ে আসে। আমিনা বলে, "খান সেনারা সব গ্রামে ঢুকছে। শীগ্‌গির ঘরে শিকল দিয়া আখতাররে লইয়া আমাদের বাড়িতে আস। আমরা গ্রাম ছাইড়া যাইতাছি।" সে আরও বলল তারা এখনই খিড়কির দরজা দিয়ে পিছনের মাঠে নেমে পড়বে। সেখান থেকে সবাই মিলে নদীর পারে যাবার চেষ্টা করবে—যদি নৌকা পাওয়া যায়। বলেই আমিনা দৌড়ে চলে গেল।

অন্ধকার ততক্ষণে পুরোপুরি নেমে এসেছে। আকাশ ঘন কালো, চারপাশের গাছপালা নড়ছে না—হাওয়া নেই একটু, কেমন যেন চাপা নিস্তব্ধ ভাব। রাবেয়া তার কথা বলবার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে, তাড়াতাড়ি কোন কাজই সে সারতে পারছে না। হাত পা যেন অবশ হয়ে আসছে। হঠাৎ বাড়ির কাছেই একটা প্রচণ্ড কোলাহল শুনতে পেল রাবেয়া—তার সঙ্গে 'দুম' করে বন্দুকের আওয়াজ। চারদিকের অন্ধকার যেন আর্তনাদে আলোড়িত হয়ে উঠল। হঠাৎ তার সম্বিত যেন ফিরে এল। কি হল তার? এত দেরি সে কেন করছে? এর পরে যে আমিনাদের সঙ্গ ধরতে পারবে না! ত্বরিত পদে গোছানো কাপড় ও গয়নার পুঁটুলি নিয়ে উঠোন পেরিয়ে রাবেয়া এই ঘরে এল। এই ঘর থেকে আখতারকে নিয়ে যেতে হবে। উঠোন পার হতে গিয়ে রাবেয়ার চোখে পড়ল পাশের বাড়ি রায়দের পরিত্যক্ত ভিটে দাউ দাউ করে জ্বলছে। সান্ধ্য আকাশের রং বদলে গেছে। গ্রামের অনেক বাড়িতেই আগুন লেগেছে—লেলিহান শিখা লকলক করে উঠছে আকাশপানে। সারা শরীরে যেন সেই আগুনে তাপ অনুভব করল রাবেয়া।

তাড়াতাড়ি আবার সে ছুটতে লাগল নদীর দিকে।

তাড়াতাড়ি এ ঘরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে রাবেয়া সামনের দিকে তাকালো—কয়েক জন খানসেনা তাদের দাওয়ায় এসে উঠছে। বিদ্যুৎ-বেগে ঘরে ঢুকল রাবেয়া, দৌড়ে বিছানা থেকে ঘুমন্ত আখতারকে বুকে তুলে নিল। নিজের কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে এল। তারপরেই প্রাণপণে ছুট দিল নদীর দিকে। হয়তো ওখানে আরো সঙ্গী পাওয়া যাবে। চৌধুরী বাড়িতে আর যাবার উপায় ছিল না। সেই বাড়ির দরজা ভেঙে ততক্ষণে খান সেনারা ঢুকে পড়েছে। আমিনাদের অদৃষ্টে কি ঘটেছে—তারা পালাতে পেরেছে কিনা—তা বোঝবার কোন উপায় নেই।

রাবেয়া কেবলই দৌড়াচ্ছে—চারদিকে কি ঘটছে তার কোন খেয়াল নেই। বুকে আখতার নিঃসাড় হয়ে ঘুমাচ্ছে, ভুল করে সে পুঁটুলিটা ফেলে এসেছে বাড়িতে—অবশ্য তাই নিয়ে চিন্তা করবার মতো মনের অবস্থা তার তখন নেই। আখতারকে নিয়ে যে সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, এই তার যথেষ্ট ভাগ্য। চারদিকে বন্দুকের গুলির শব্দ আর বারুদের গন্ধ। এক মিনিটের জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে রাবেয়া দেখতে পেল দূরে তাদের খড়ের চাল, দাওয়ার খুঁটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। অন্ধকার আকাশ লাল হয়ে উঠেছে সেই বিধ্বংসী আলোর আভায়। নিস্তব্ধ রাত্রি মুখরিত হয়ে উঠেছে আহত মানুষের আর্তনাদে। দুচোখ জলে ভরে এল রাবেয়ার। না—দাঁড়িয়ে আর সময় নষ্ট সে করবে না। তার কোলের আখতারকে বাঁচাতে হবে। তাড়াতাড়ি আবার সে ছুটতে লাগল নদীর দিকে।

অবশেষে নদীর তীরে এসে পৌঁছালো রাবেয়া। ঠাণ্ডা একঝলক হাওয়া এসে তার শরীর জুড়িয়ে দিল। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল নদীর

তীর বরাবর আরও কিছুখানি হেঁটে গেলে খেয়াঘাট পড়বে। মনে হলো সেখানে আরও কয়েক জন তার মতো এসে মিলেছে। তবুও এদিকটা নির্জন। পাশবিক লীলার আর্তনাদ আর বন্দুকের আওয়াজ এখানে এসে তেমন পৌঁছাচ্ছে না। খেয়াঘাট এসে পড়েছে প্রায়—আর সামান্য পথই বাকী। হঠাৎ তার কেমন যেন সন্দেহ হল। আখতার তার বুকে এত নিশ্চুপ হয়ে মিশে আছে কেন? অজ্ঞান হয়ে পড়ল কি? এতক্ষণ তো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এসেছে রাবেয়া—কিছুই লক্ষ্য করেনি। নিরাপদ দূরত্বে এসে এতক্ষণে তার খেয়াল হলো। তাড়াতাড়ি কাপড় তুলে অন্ধকারে সে দেখতে চাইল তার অতি আদরের আখতারের মুখখানা। এ কী! কোথায় আখতার? তার কোলে তাদেরই বিছানার পাশবালিশকে সে আকড়ে রয়েছে। সমস্ত চেতনাকে ঢেকে অন্ধকার নেমে এল। শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠল, দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা তাদের খড়ের চাল আর বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা একগুচ্ছ ফুলের মতো আখতারের মুখখানা। অন্ধকারে সেই প্রচণ্ড সংকট মুহূর্তে ভুলের ঘোরে বিছানা থেকে কাকে তুলে এনেছে দুর্ভাগিনী! রাবেয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠল, আগুন খড়ের চাল আর ঘরের দেওয়াল বেয়ে লোভীর মত সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে আখতারের দিকে। আরও কাছে—আরও—। সে যেন শুনতে পেল একটি কচি কণ্ঠের ডাক 'আম্মা'—। নিষ্পাপ, অবোধ শিশু যেন সেই আলো অন্ধকারে দুটি কচি কচি হাত বাড়িয়ে খুঁজছে তার আম্মাকে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে সেই শিশু……

আর ভাবতে পারল না রাবেয়া। আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে পাগলের মত চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আকুল আর্তনাদে সে ভেঙে পড়ল—"আখতার—আখতা-র" সেই নিকষ কালো রাত্রির গভীর অন্ধকারে মায়ের সেই আকুল ডাক আস্তে আস্তে নদীর উপর দিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো বাতাসে—চলে গেল বহুদূরে।

অন্ধকারে আকাশ ভরা তারা, হাওয়া নেই একটুও। বাঁশঝাড় নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ—বয়ে চলেছে ধলেশ্বরী তার গভীর কালো জল নিয়ে। হঠাৎ নদীর বুকে ঝুপ করে একটা শব্দ হলো—ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তারপরেই আবার সব স্থির। ধলেশ্বরী কুলুকুলু শব্দ করে বয়ে চলল মেঘনার দিকে।*

* সত্য ঘটনার ছায়াবলম্বনে।

"ভুবনমোহন সরকার স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"র
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

দিদির খোঁজে

সুধাংশুশেখর মহাপাত্র

সে দৃশ্যটা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। পদ্মার তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম জহির সাহেবের সঙ্গে। উনিও মনের মত একজন শ্রোতা পেয়ে সেই বিকেল থেকে একনাগাড়ে বলে যাচ্ছিলেন, বাংলাদেশের ওপর ইয়াহিয়ার অকথ্য অত্যাচারের কথা। তাঁর সংক্ষিপ্ত কাহিনী যখন শেষ হয়ে এল, তখন সূর্যটা একেবারে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে ; তাঁর রাঙা রশ্মি পদ্মার জলে পড়ে রামধনুর বর্ণালী জাগিয়ে তুলেছে। আমি একমনে নদীর জলটার দিকে চেয়েছিলাম। হঠাৎ কানে এক করুণ সুর ভেসে এল, "দিদি, ফিরে আয় দিদি—"

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঘাড় ফেরালাম। একটি বছর নয়-দশের বাচ্চা ছেলে নদীর তীরে তীরে থমকে থমকে হেঁটে চলেছে। চুলগুলো তার উসকোখুসকো—বাতাসে কাঁপছে। হাতদুটো সামনের দিকে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বাড়ানো। আমার মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। জহির সাহেব বললেন, "ওর নাম রাজু। আমাদেরই পাড়ার ছেলে। কিন্তু এখন ওর কেউ বেঁচে নেই।"

জহির সাহেবেরও গলাটা ভারী হয়ে এল ঃ খানসেনারা ওর সবাইকে মেরে ফেলেছে। বংশের মধ্যে কেবল ও-ই একা বেঁচে গেছে কোনমতে। ওদের বাড়িতে যেদিন সেই নরখাদক পাঠানরা আক্রমণ চালিয়েছিল, রাজুর সেদিন ভীষণ জ্বর। তাই ওর বাপ-মা কোথাও পালিয়ে যাওয়ার অবসর পাননি। পশুরা ওর বাবা-মাকে একে একে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছিল।

ওর দিদি তখন ওকে রক্ষা করার জন্য কোনমতে ওকে নিয়ে বাইরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না হতভাগিনী মেয়েটা। হিংস্র ভল্লুকের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভদ্রতার মুখোসধারী লম্পটের দল। রাজু চেঁচিয়ে উঠেছিল, "ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, দিদিকে তোমরা মেরো না—"

কিন্তু প্রত্যুত্তরে সঙ্গে সঙ্গে ওর দুই চোখে নেমে এল তীক্ষ্ণ সূচালো ছুরি। জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই ও মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছিল। আমরা সকালে গিয়ে ওকে তুলে নিয়ে আনি। সেই থেকে ছেলেটা অন্ধ হয়েই আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি জানলেন কি করে এসব ?"

জহির সাহেব বললেন, "জ্ঞান হওয়ার পর রাজুই সবকিছু বলেছিল। কিন্তু এখন ও পাগল। সারাদিন কেবল 'দিদি দিদি' করে ঘুরে বেড়ায়। ওর দিদি যে নেই, সে কথাটা ওকে বলতেও ভয় করে। তাহলে ছেলেটা হয়ত আর বাঁচবেই না—"

"ওর দিদি কি সত্যি বেঁচে নেই ?"

"না থাকাটাই স্বাভাবিক। ওদের হাত থেকে কেউ ফিরেছে বলে তো শুনিনি।"

আমার চোখদুটো ছলছল করছিল। দেখলাম, রাজু তখন অনেক দূরে চলে গেছে। তার হাতদুটো তেমনি সামনের দিকে বাড়ানো। অস্পষ্টভাবে যেন শুনছিলাম, "দিদি, ফিরে আয় দিদি—"

* * *

পরদিন সকালে দেখা করলাম রাজুর সঙ্গে। জহির সাহেব যা যা বলেছিলেন ও হুবহু তাই বলে গেল। একটুও পাগলামির লক্ষণ দেখলাম না ওর মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা রাজু, তোমার দিদি বেঁচে আছে ঠিক জানো ?"

"হ্যাঁ বাবু, বেঁচে নিশ্চয় আছে। দেখবেন, একদিন ওকে ঠিক খুঁজে বের করব।"

ওর বিশ্বাসের উপর খড়গহস্ত হতে ইচ্ছে করল না। কয়েকটা সান্ত্বনার কথা বলে উঠে পড়লাম। রাজু কিন্তু একটুও কিছু বলল না।

এদিকে আবার আমার দিন ফুরিয়ে আসছিল। মাত্র এক সপ্তাহের অবসর নিয়ে এসেছিলাম পূর্ব বাংলায়। কিন্তু এই কদিনে দেশটার প্রতি এমন এক মোহ জন্মে গিয়েছিল যে, কিছুতেই ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। মনে হচ্ছিল, এ দেশের সমস্ত মানুষ যেন আমার আপনার জন—এদের ছেড়ে থাকা যায় নাকি আবার ! বিশেষ করে ওই রাজুকে ছেড়ে—

কথাটা একদিন তুলে ফেললাম জহির সাহেবের কাছে, "আচ্ছা জহির সাহেব, রাজুকে যদি আমি কলকাতায় নিয়ে যাই, আপনাদের কোন আপত্তি আছে ?"

"না না, কিচ্ছু হবে না।" সানন্দে সায় দিলেন উনি—"ছেলেটার কেউ কোথাও নেই ! আপনি যদি আশ্রয় দেন, তাহলে হয়ত ও মানুষ হয়ে উঠতে পারে।"— বলেই হাসিমুখে সম্মতি জানালেন।

আসার দিন জহির সাহেবের বাড়িতে গেলাম। কয়েক মিনিট এ-কথা ও-কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম, "রাজু কোথায় ?"

সহসা জহির সাহেব কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

তখন ওঁর মুখ দেখে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটু পরেই সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। উনি আমাকে পদ্মার তীরে তীরে অনেকটা হাঁটিয়ে আনলেন। তারপর একটা বিরাট পাকুড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে জলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, "ওই দেখুন, রাজু তার দিদিকে পেয়ে গেছে সুনীলবাবু।"

আমি চমকে উঠে জলের দিকে তাকালাম। দেখি, একটা পচা শবদেহ আঁকড়ে রাজুর প্রাণহীন দেহটা জলের উপর ভাসছে। ওর হাতদুটো এখন কিন্তু আলগা নয় ! বেশ পেঁচিয়ে শক্ত করে ধরেছে ওই গলিত মড়াটাকে। আমার চোখ দিয়ে কখন ঝরঝর করে জলের ধারা

নেমে এসেছিল বুঝতে পারিনি। দেখলাম, জহির সাহেবও আস্তিনে চোখ মুছছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন করে হল?"

সাহেব উত্তর দিলেন, "জানি না।"

কিছুক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা যোগালো না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওই মড়াটি কি ওর সত্যিকারের দিদির?"

জহির সাহেব তেমনি ভাবে উত্তর দিলেন, "কেমন করে জানব—ওটা এত পচেছে যে চেনাই যায় না।"

বলেই দ্রুত হেঁটে চলে গেলেন উনি। আমিও আর দাঁড়াতে পারলাম না। তক্ষুণি কলকাতার টিকিট কেটে রওনা হলাম। পথে আসতে আসতে সারা রাস্তা কে যেন আমার কানের কাছে ফিসফিস করে একটানা বলে চলল, 'দিদি, ফিরে আয় দিদি'—

"হ্যাঁ বাবু, বেঁচে নিশ্চয় আছে।" [পৃষ্ঠা ৬০২

কলিকাতার হাজরা রোড হইতে শ্রীসন্তোষকুমার দে তাঁর স্বর্গগত পিতা শ্রীপদ দের পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন।

তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺শ্রীপদ দে স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ঃ

ভক্তিমূলক পৌরাণিক আখ্যান

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০শে কার্তিক, ১৩৭৯। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা আগামী মাঘ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা**

হাঁদা ভোঁদার
এ্যাকটিং
হাঁদা! স্টেজে নাকি লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটক হচ্ছে, চ' দেখে আসি।
বলছিস যখন চ' যাই।
হায় হায়! ভাই রে লক্ষ্মণ, এ কি হলো!
ফুঃ! এই ধরণের নিকৃষ্ট অভিনয় দেখে তুই কেঁদে ভাসাচ্ছিস? অবাক করলি ভোঁদা!
যাই বলিস হাঁদা, ঐ করুণ দৃশ্যটা কিন্তু দারুণ জমেছিল! আমি চেষ্টা করেও কান্না চাপতে পারিনি!
রাবিশ! আমি তোকে দেখিয়ে দেবো ভোঁদা, যে করুণ দৃশ্যের এ্যাক্‌টিং করা কাকে বলে।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল
স্কুলের অভিনয়ে আমি এই পার্টটা করেছিলাম এবং আমার এ্যাকটিংয়ে প্রত্যেকে কেঁদে ভাসিয়েছিলো!
আমিও পারি!

শোন ভোঁদা! হায় হায়! প্রাণের ভাই আমার, আর নেই! নেই! নেই!
হায় রে লক্ষ্মণ, ভাই রে লক্ষ্মণ, আমায় ফেলি কোথায় গেলি! কোথায় গেলি!
উস্‌ল্ উস্!
করুণ দৃশ্যের এ্যাক্‌টিং কেমন দেখলি? আমি বলেছিলুম না যে তোকে কাঁদিয়ে ছাড়বো!
আমি কাঁদছি না রে হাঁদা! আমি বাড়িতে রান্নার জন্যে পেঁয়াজ ছাড়াচ্ছি! তোর ঐ মজার এ্যাক্‌টিং আবার করনা ভাই!
য্যাঃ!

তিন বন্ধুর কেরামতি

বিশ্ববন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

একেবারে ফাটিয়ে দেবে—এমন রৌদ্রের তাপ সে দিন। মানুষজন চলাফেরা কম করছে। তবে কাজের গরজে দু একজন এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করছে। নেহাত না গেলে নয় ভাই।

এই পিঠফাটা রৌদ্রে কিন্তু তিনজন লোক বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। তাদের নদীর ওপার না গেলেই নয়! চাটুর মত গরম মাটিতে হেঁটে তিনজনেরই পায়ে ফোস্কা পড়েছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে। তবুও হাঁটতে হবে। নদীর ঘাটে তারা এসেছে। তাদের মধ্যে একজনের গা দাদে ভরা। শুধুই চুলকাচ্ছে, খসর-খসর। উপর থেকে সূর্যের তাপে দাদ আরও সতেজ। আর একজন ভুগছে চোখের রোগে। চোখ কচলে-কচলে সাড়া হয়ে গেল বেচারী! তৃতীয় জনের মাথায় আবার এক বিরাট টাক মোহনবাগানের মাঠের মত। চড়চড় করে টাক যখন চিড়বিড় করে উঠছে তখন হাতের চেটো দিয়ে তাকে শান্ত করতেই সে ব্যস্ত। তিন বন্ধুরই দুর্গতি আজই যেন চরমে উঠবে। বাড়ি থেকে তারা বেরিয়েছে কিন্তু পয়সা একটিও নাই ট্যাকে। না থাকারই কথা কেননা তাদের ধারণা ছিল এমন দিনে নিশ্চয়ই নদীতে জল থাকবে না। কিন্তু ভগবান্ বিরূপ। নদীতে জলও আছে, পার হতে গেলে পয়সাও লাগবে। মাঝীরা রাজী হল না ওপার যেতে। তাছাড়া বিনা পয়সায় কেউ যায় নাকি! হবে না, হবে না। এরাও নাছোড়বান্দা! হাতে-পায়ে ধরে মাঝীদের রাজী করাল। মাঝীরাও একটি শর্ত রাখল, 'ঠিক আছে, তোমাদের পৌঁছে দোব বিনি পয়সায়। কিন্তু নৌকায় উঠে তোমরা হাত জোড় করে চুপচাপ বসে থাকবে। একটু নড়ন-চড়ন হলেই কিন্তু বিপদ।' তিন জনেরই অবস্থা কিন্তু কাহিল। এ কি রে বাবা! এ যে বিপদের ওপর বিপদ। কিন্তু কি করা যায়? যাক, শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া আর তো কোন উপায় নাই!

নৌকা ঘাট ছাড়ল। হাত জোড় করে তিনজন তীর্থের কাকের মত বসে আছে নৌকায়। মাঝ নদীতে তখন তারা। ওরে বাবা রে, আর যে—অসহ্য। গা চিড়বিড় করছে, চোখ যে গেল, মাথা যে আর থাকল না! না, দারুণ যন্ত্রণা। প্রাণ বুঝিবা এই শেষ বোধহয়। কি করা যায়? যদি জোড় হাত রাখার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি মাঝীরা শাস্তি দেবে। নৌকা হয়ত ফিরিয়েই দেবে। হে করুণাময়! তুমি কোথায়!! গেলাম যে! তিনজনেই হা-হুতাশ করছে। মাঝেমাঝে সংকেতও হচ্ছে চোখে-চোখে। যাক এতক্ষণে ফন্দি এসেছে মাথায়। প্রথমটির দাদ তখন দারুণ রূপ ধারণ করেছে। না চুলকালেই নয়। সে মাঝিদের একটি গল্প বলতে লাগল। সে বলা আরম্ভ করল, 'জানো মাঝিভাই, আমার বড়দা না, বিরাট শক্তিশালী পুরুষ। একবার যদি দেখ না, আর চোখ ফেরাতে হবে না। অবাক্ হয়ে দেখতে হবে। এমনি তার শরীর! এক মুঠো সরষে নিয়ে, বুঝলে কিনা, এমন ভাবে গেলে দেয় যে সরষে থেকে টপটপ করে তেল পড়তে থাকে। তারপর না, সেই তেল দুহাতে নিয়ে গোটা গায়ে ভাল করে মালিশ করে। তাকাও, এই ভাবে!' বলে সে দুই হাতে গোটা গা ভাল করে মালিশ করে নিল। দাদের চুলকানিও শেষ। মাঝীরা হাঁ করে তার পানে তাকিয়ে থাকল। মানুষ এমনও শক্তিশালী হয়।

এদিকে আর একজনের চোখে চিট্‌পিটানি চড়চড়িয়ে বাড়ছে। তাই তো উপায় কি? সেও একটি গল্প শোনাতে লাগল, 'মানুষের রকম-ফের তো আছেই! আমি যা বলছি শুনে থ হয়ে যেতে হবে। আমাদের তো অনেক ভেঁড়া আছে! একটির শিং ছিল না, বুঝলে কি না! অথচ সেই ভেঁড়াটি বুড়ো ছিল। একদিন সকালে উঠে দেখি তার শিং গজিয়েছে। সে শিং কি যেমন তেমন রে ভাই! কি বলব তোমাকে, বলা যায় না। তার চোখের ঠিক কোণায় শিংটি দশটি ভাঁজ হয়ে আছে। দেখবার মত! এই দেখ না—' বলে সে নিজের দুই চোখে দশবার হাত দুটি ঘুরিয়ে নিল। চোখ কচলান শেষ তার। মাঝী ভায়া একি শুনছে? মুখের হাঁ আর পড়ে না যে।

কিন্তু তৃতীয় জনের এতক্ষণে সাংঘাতিক অবস্থা। মাথার খুলি খান খান হতে আর কতক্ষণই বা আছে? না, খেলেছে বুদ্ধি মাথায়। নৌকার মাঝখান হতে জলের পাশে গিয়ে বসল সে। একেবারে ধারে। হাত দুটি খুলে বসল। দুই হাতে জল তুলে সে মাথায় দিতে দিতে বলতে লাগল, 'ধন্য তোমার দাদা, ধন্য তোমার ভেঁড়া রে ভাই! তোমার দাদার শ্রীচরণে শতশত প্রণাম জানাই হে!' এই বলে বারে বারে জল হাতে নেয় আর মাথায় ঠেকায় প্রণাম করার ভঙ্গীতে। আর মাঝীরা ভাবছে—সত্যিই তো! আশ্চর্য। হাতে গেলে তেল! শিংটাও বিচিত্র!

ইতিমধ্যে নৌকা ওপার। টপাটপ তিন জনেই লাফিয়ে মাটিতে পা রাখল। মাঝীরা তখন বিচিত্র কথা শুনে কি ভাবে অন্যদের বলবে তাই ভাবছে!

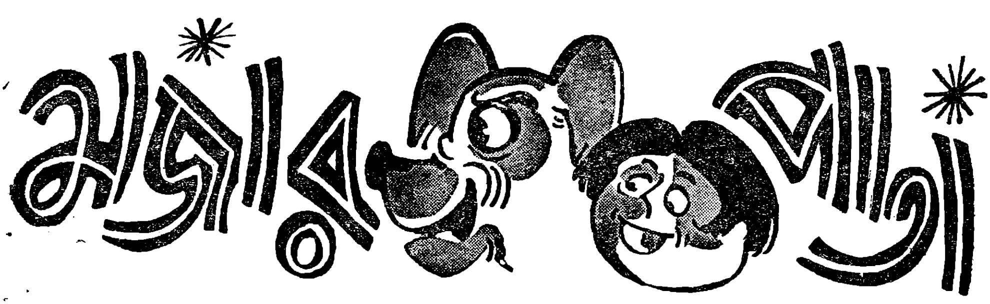

নতুন ধাঁধা

১। বহুবিধ বর্ণ হরেকরকম মাপে
বিশ্বমাঝে খুঁজলে পরে অনেকগুলিই পাবে।
যুক্তক্ষরের 'ত' কে যদি 'থ' করে দাও—
শেষ অক্ষর বাদ দিয়ে জ্যামিতিতে পাও॥ —বিশ্বজিৎ ঘটক, গৌহাটি-১২।

২। প্রথমে পানীয় যার
শেষেতে হৃদয়,
সকলেই বলে তাহা
পূর্ণ ক্রিয়া নয়। —পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা, ছড়রা, পুরুলিয়া।

৩। পেট্‌টি কাটা কম কথা নয়,
লেজ কাটলে শব্দ যে হয়। —শ্যামাপ্রসাদ দাস, বদনগঞ্জ, হুগলী।

গত শ্রাবণ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। বাসনা ২। দরদ ৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত শ্রাবণ সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—ভাস্কর, উজ্জ্বল, উৎপল ও সুদীপ—ডোভার লেন; শুভ্রা, চৈতী, জলি, ডলি, জয় ও জুহু—চারু অ্যাভেন্যু; অপরূপ, স্বপন ও শ্যামল ভট্টাচার্য—গোপী সেন লেন।

২৪ পরগনা—বিশ্বজিৎ ও চিরশ্রী ব্যানার্জী—ইছাপুর; মৌসুমী, চৈতালী, পার্থ ও মিতালি বসু—বারাসাত।

মেদিনীপুর—কৃষ্ণা, রীণা ও পর্ণা চক্রবর্তী—তমলুক; সুখেন, শিকাশ্রী, দেবযানী, **ভীমটু**, সন্টু, পন্টু, ও ভবানী—গেঁওখালী।

বর্ধমান—রাণা ও মধুমিতা দাশগুপ্তা—ধাদকা।

বীরভূম—তৃপ্তি, কল্যাণী, দেবীসাধন, রচনা, বেনু, রেনু ও কানু—বড়বেলুন।

হাওড়া—ব্রততী রায়—উমেশ ব্যানার্জী লেন; তৃপ্তি, দীপ্তি, প্রীতি, শুক্তি ও সিন্টু বসু—দাওনা গাজী রোড।

বিহার—বাবা, মা, দীপু, মিতা ও টিঙ্কু—চক্রধরপুর।

উত্তরপ্রদেশ—রূপা, শঙ্কর, মা ও বাবা—এলাহাবাদ।

মধ্যপ্রদেশ—গোপাল, খোকন, রীণা ও খোকা—বিলাসপুর।

Shilpi HPMA 31A/71 Ben

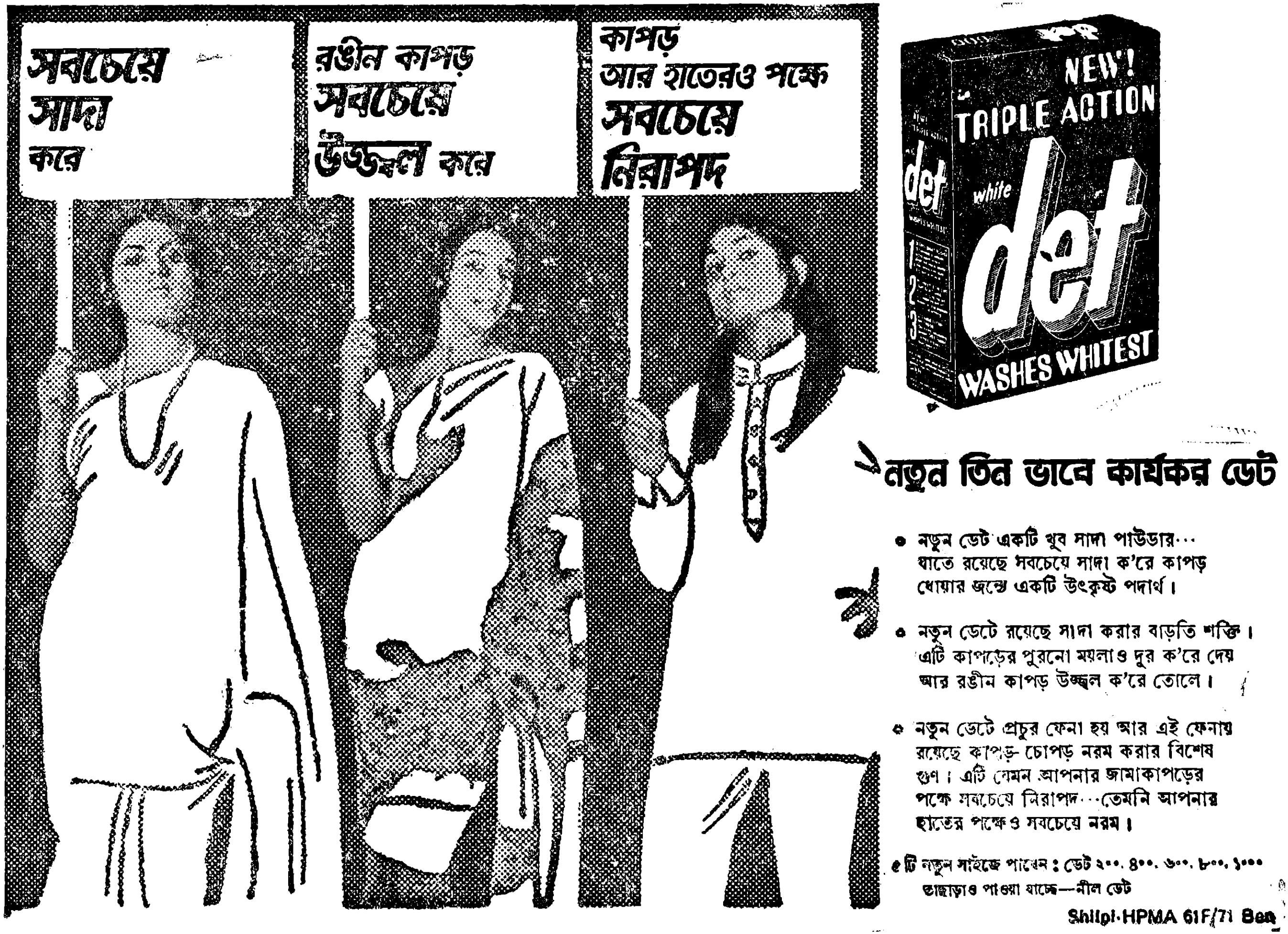
সবচেয়ে সাদা করে
রঙীন কাপড় সবচেয়ে উজ্জ্বল করে
কাপড় আর হাতেরও পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ
NEW! TRIPLE ACTION
white det
WASHES WHITEST
নতুন তিন ভাবে কার্যকর ডেট
• নতুন ডেট একটি খুব সাদা পাউডার··· যাতে রয়েছে সবচেয়ে সাদা ক'রে কাপড় ধোয়ার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ।
• নতুন ডেটে রয়েছে সাদা করার বাড়তি শক্তি। এটি কাপড়ের পুরনো ময়লাও দুর ক'রে দেয় আর রঙীন কাপড় উজ্জ্বল ক'রে তোলে।
• নতুন ডেটে প্রচুর ফেনা হয় আর এই ফেনায় রয়েছে কাপড়-চোপড় নরম করার বিশেষ গুণ। এটি যেমন আপনার জামাকাপড়ের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ···তেমনি আপনার হাতের পক্ষেও সবচেয়ে নরম।
৫টি নতুন সাইজে পাবেন: ডেট ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০, ১০০০
তাছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে—নীল ডেট
Shilpi·HPMA 61F/71 Ben

ছাত্রগণ! তোমাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট থাকলে কেমন হয়?

নিজের চেক সই করতে কি যে আনন্দ!

তোমার বাবার নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট আছে। ক্লাবের বিল অথবা তোমার স্কুল ফি দেবার জন্য তাঁকে হয়ত চেক সই করতে দেখেছ। পিএনবি-র স্পেশাল ষ্টুডেন্ট ডিপোজিট স্কিম অনুসারে তুমি তোমার নিজের ব্যাঙ্ক-এ্যাকাউন্ট খুলতে পার ... তোমার নিজের চেক বইও থাকবে। তোমার স্কুল ফি, নতুন বই কেনা বা অন্য কোন দরকারে নিজেই চেক কেটে দাও।

আমাদের সঙ্গে এ্যাকাউন্ট খুলতে হলে তোমাকে শুধু তোমার বাবা, মা অথবা অভিভাবকের কাছ থেকে বয়সের একটি প্রমাণ-পত্র যোগাড় করে আনতে হবে।

আমাদের যে কোনো শাখায় এসে এখনই জমা শুরু করে দাও। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে তুমি সঞ্চয় করতে পার—স্বল্প পরিমানে নিয়মিত সঞ্চয় মানেই পরে মোটা টাকার নায়ক। শতকরা ৪ টাকা হার সুদে পি এন বি-তে তোমার সঞ্চয় বাড়বে।

যদি তোমার বয়স ১৪ বছরের কম হয় তাহলে তোমার বাবা, মা অথবা অভিভাবক তোমার নামে ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। ছোট্ট একটি পাশ বই তোমাকে দেওয়া হবে তাতে হিসাব থাকবে কত টাকা তুমি জমা করেছ।

একথা সব সময় মনে রেখ যে পি এন বি-তে তোমার সঞ্চয় বেড়ে চলেছে!

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

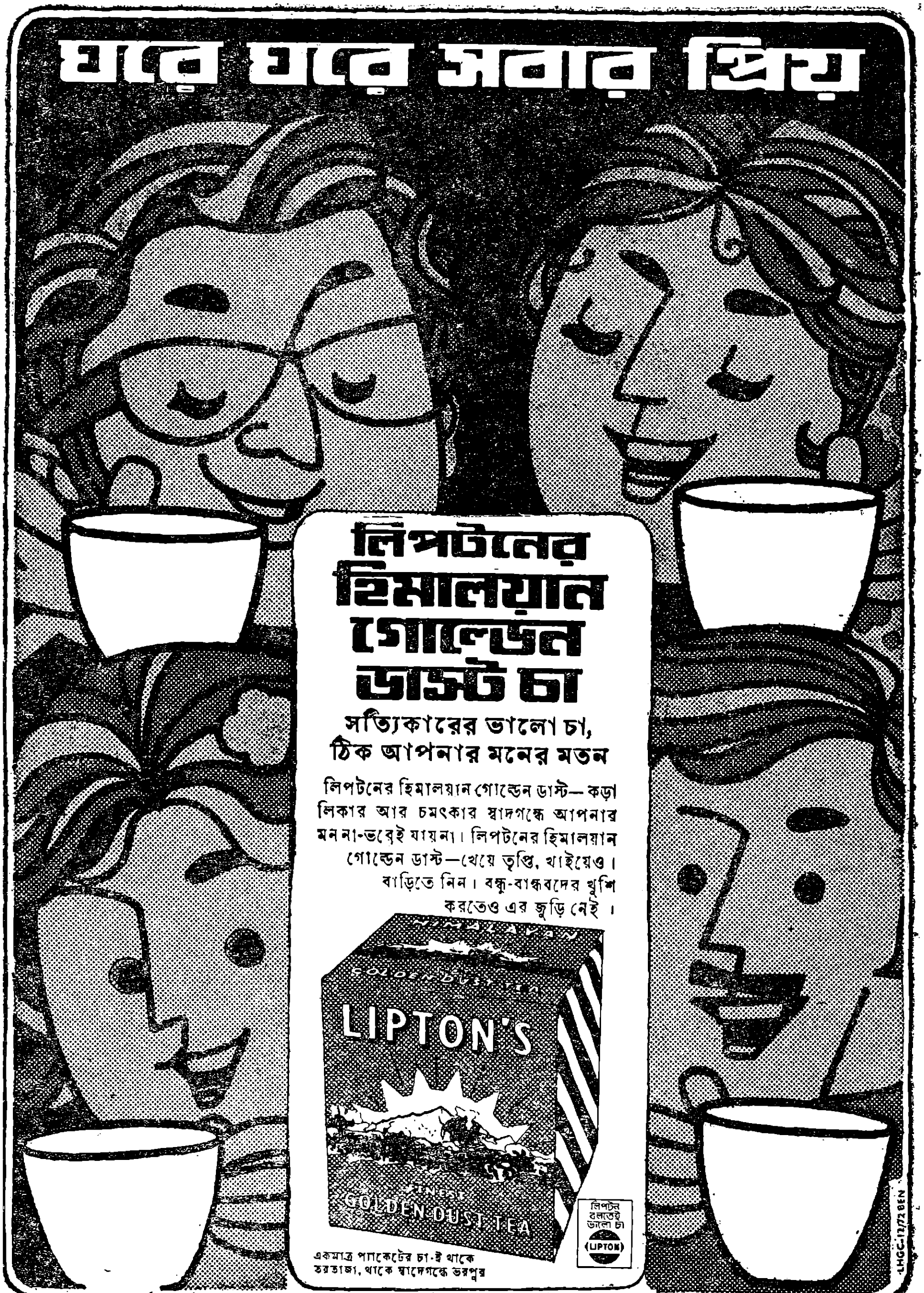
ঘরে ঘরে সবার প্রিয়
লিপ্টনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট চা
সত্যিকারের ভালো চা,
ঠিক আপনার মনের মতন
লিপটনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট— কড়া লিকার আর চমৎকার স্বাদগন্ধে আপনার মন না-ভরেই যায় না। লিপটনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট—খেয়ে তৃপ্তি, খাইয়েও। বাড়িতে নিন। বন্ধু-বান্ধবদের খুশি করতেও এর জুড়ি নেই।
LIPTON'S
GOLDEN DUST TEA
লিপটন বললেই ভালো চা
LIPTON
একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদেগন্ধে ভরপুর
LHGC-12/72 BEN

AIYARS-C.165 BN

থিন এরারুট

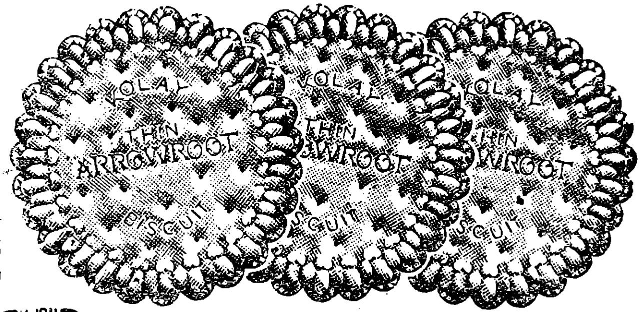

KB/3/71B

IS 1011

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, কলি-১০

ছুটির চিঠি

ভাই ভোম্বোল

৬দিন হোল দার্জিলিং এসেছি। কি করে যে কেটে গেল জানি না। প্রায় রোজই ঘোড়ায় চড়ছি

এর মধ্যে একদিন খুব ভোরে টাইগার হিল থেকে সানরাইজ দেখতে গেলাম।
এখানে প্রত্যেক দিন দারুন মজা।
আজ শেষ করি। কাল সক্কালে
গাড়ী করে জলদাপাড়ায় গন্ডার দেখতে যাব কিনা।

— ইতি তোর বন্ধু খোকন।

পুনঃ পড়াশুনা কিছু হচ্ছে না।

TOURIST LODGE

Government of West Bengal, Darjeeling, Phone: 656

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

ও

সাধক মহাপুরুষদের জীবন কথা

বৈষ্ণবদের পরম আদরের ধন এই **ভক্তমাল গ্রন্থ।** ইহাতে আছে বৈষ্ণব ভক্তদের অলৌকিক কাহিনী, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের অপূর্ব লীলাপ্রসঙ্গ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসের বিশ্লেষণ, সখা ও সখীগণের পরিচিতি এবং শ্রীবৃন্দাবনধামের বিশদ বর্ণনাও ইহাতে আছে।

এই সংস্করণের বিশেষত্ব ঃ পাদটীকার দুরূহ শব্দের অর্থ, বিভিন্ন পাঠান্তর, শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক এবং পরিশিষ্টে শ্লোকসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

তাহা ছাড়াও এই বিরাট গ্রন্থে একটি নূতন অংশ যোগ করা হইয়াছে যাহা **বাংলা ভাষায় অথবা ভারতীয় কোন ভাষাতেই এপর্যন্ত হয় নাই।** বর্তমান যুগ ধর্মসমন্বয়ের যুগ—ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধক মহাপুরুষদের জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অনেক পরিশ্রমে বহু গ্রন্থ এবং বহু পত্র-পত্রিকা অনুসন্ধান করিয়া **এইরূপ একশত জীবনী তাঁহাদের প্রতিকৃতি সহ সংগ্রহ করা হইয়াছে।**

রামায়ণ মহাভারতের আকারে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ...ভক্তদের প্রতিকৃতি ছাড়াও আর্টপ্লেটে অসংখ্য রঙীন ছবি—**মূল্য মাত্র ষোল টাকা।**

দেব সাহিত্য কুটীর · কলিকাতা-৯

এবার পূজায়

দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত ছোটদের বার্ষিকী

পূরবী

মূল্য ৮·০০ টাকা • **লিখছেন:**

বনফুল সমরেশ বসু প্রেমেন্দ্র মিত্র বিমল মিত্র আশাপূর্ণা দেবী নীহাররঞ্জন গুপ্ত
প্রমথনাথ বিশী দৃষ্টিহীন হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বিধায়ক ভট্টাচার্য
শিবরাম চক্রবর্তী মায়া বসু এ ছাড়া আরও অনেকে

পূজার অর্ঘ

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

পরশপাথর

ছোট বড় নানা ধরণের গল্প-সংকলন।
অসংখ্য একরঙা ও রঙিন্ ছবির সমারোহ।
ছোটদের মনের মত বই।

মূল্য ৫·০০ টাকা

পূজার উপহার

রোমান্টিক গল্প নিয়ে লেখা অনেকগুলি অবাক-করা মজাদার নাটিকা। পড়তে গেলে হাসতে হাসতে দম আটকায়। সুন্দর সুন্দর ছবি। মূল্য ৫·০০ টাকা

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

ক্রিমিন্যাল অমরেশ

এবার পূজায়

দেব সাহিত্য কুটীরের সম্পাদনায়

মুরারি মোহন বিটের

ছোটদের আরব্য উপন্যাস

ছোটদের জন্য বিশেষভাবে লেখা আরব্য রজনীর বিস্ময়কর রূপকথা। পড়তে সুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। অনেক গল্প অনেক ছবি।

মূল্য ৫·০০ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর • কলিকাতা-৯